ঊষালগ্ন

ধীরেন্দ্রনাথ মিত্র

সত্যব্রত লাইব্রেরী

১৯৭, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

প্রথম সংস্করণ
১৫ আশ্বিন, ১৩৬২

প্রকাশক
সত্যব্রত গুহ
সত্যব্রত লাইব্রেরী
১৯৭, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট

প্রচ্ছদশিল্পী
খালেদ চৌধুরী

ব্লক
ভারতবর্ষ হাফ্‌টোন ওয়ার্কস্

প্রচ্ছদ-মুদ্রক
মোহন প্রেস
১, করিশচার্চ্চ লেন
কলিকাতা-

মুদ্রক
উপেন্দ্রমোহন বিশ্বাস
আই. এন. এ. প্রেস
১৭৩, রমেশ দত্ত ষ্ট্রীট
কলিকাতা—৬

প্রুফ সংশোধন করেছেন
শিশির পাল

দফতরী
নিউ বেঙ্গল বাইণ্ডার
কলিকাতা—৯

দু' টাকা
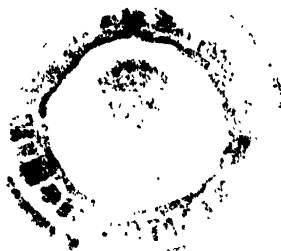
শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র

শ্রীচরণেষু

স্বয়ংবরা

লিফ্‌টে উঠে এসেও মণিকার মনে হ'ল ও যেন এখনও চারতলার সিঁড়ি ভাঙ্‌ছে, সমস্ত দেহ ক্লান্তিতে অবশ। অফিস ঘরের বারান্দায় রেলিংয়ে ভর দিয়ে শরীরের অবস্থাটা একবার অনুমান করার চেষ্টা করে মণিকা। গলায় ঘাম, চোখের কোলে ঘাম, সারা গা ঘামে ভিজে গেছে। ব্লাউজটা বুকে-পিঠে লেপ্টে আছে পাতলা চামড়ার মত। আর পা থেকে কোমর পর্যন্ত অসহ্য একটা ব্যথার টনটনানি। শরীরের আর দোষ কি? যে মেয়ে সারা দুপুর শ্যামবাজার-বৌবাজার ক'রে এল তার পা টাটালে সে দোষ কার? আসলে কাজটাই ঘোরাঘুরির, চাকরি করতে হলে কষ্ট সইতে হবে বৈকি।

আজ দেড় মাস হ'ল মণিকার এই অফিসে চাকরি হয়েছে, এই ইন্সিওরেন্স কোম্পানীতে। চাকরি মানে ফাইলপত্তর লেখালেখির ব্যাপার কিছু নয়, আউটডোরের কাজ, মোটর ডিপার্টমেণ্টে মোটর ইন্সিওরের কাজ। চাকরি বলতে এখানেই কি কিছু খালি ছিল? আর চাকরি করার মত যোগ্যতাই বা মণিকার কোথায়? সামান্য ম্যাট্রিকের সার্টিফিকেটখানাও যার নেই, তাকে কি চাকরি দেবেন দাশগুপ্ত। তবু এইটুকু যে হয়েছে সে কেবল দাশগুপ্তের খাতিরেই। দালালির কমিশনটুকুই শুধু ওর পাওনা। কিন্তু দাশগুপ্ত আরেকটু বিবেচনা করেছেন ওর মুখের দিকে চেয়ে, বাঁধা কমিশনের ওপর তিরিশ টাকা অ্যালাউন্স। হয়ত মণিকার চোখের দিকে চেয়ে—তাঁর মায়া

হয়েছিল। আহা, অভাবের দায়ে কত মেয়ে আজ চাকরি খুঁজে বেড়াচ্ছে। ভদ্রতাটুকু করতেও তিনি ছাড়েননি, চাকরি দেওয়ার আগে বলেছিলেন—হ্যাঁ, আপনি বরং ভাল ক'রে ভেবে দেখুন। এ তো লাইফ ইন্সিওরেন্স নয় যে বন্ধুবান্ধব ধরে তুটো কেস্ করিয়ে নেবেন। এ হলো মোটর ইন্সিওরেন্স। আপনাকে ছুটতে হবে মোটরওয়ালার পিছনে পিছনে। আর ভাবনা চিন্তা! মণিকার এখন ভাববার অবকাশ কই? বিধবা মা আর অবিবাহিতা বয়স্থা তিনটি বোনের ভার ওর একার ঘাড়ে।

গোড়ার দিকে খুব খারাপ লাগেনি মণিকার। জামা প্যাণ্ট কাটা-ছাঁটা সেলাইয়ের কাজের চাইতে এ কাজ ঢের ভাল। গাড়িওয়ালার বাড়ি বাড়ি গিয়ে মুখ ফুটে শুধু বলতে পারা। একটু অনুনয় বিনয়। কিন্তু শেষে দেখল অনেকেরই গাড়ি ইন্সিওর হয়ে আছে আগে থেকে, এজেন্ট আছে বাঁধা। কেউ ভরসা দিল ছ' মাস পরে আসবেন, রিন্যুয়েল ডেট যখন ফিরে আসবে, তখন। এই দেড় মাস অনেক হেঁটেছে মণিকা। কিন্তু ক'টা কেস্ করতে পারল? আজও তো মরিয়া হয়ে লেগেছিল। কম ক'রেও আট-দশ জনের বাড়িতে হানা দিয়েছে। একটা কেস্ও জোটেনি, কিন্তু এখন আর পা নাড়তে পারছে না। নাঃ, এ চাকরি সে ছেড়ে দেবে। এ চাকরি মেয়েদের পোষায় কখনও? রেলিংয়ে আরেকটু ঝুঁকে পড়ল মণিকা। বেলা শেষ হয়ে এসেছে, বিকেলের নরম আলো এখনও যেটুকু আছে একটু বাদে তা নিভে যাবে। যুদ্ধের পর ব্রাবোর্ন রোডের এ ফুটটা মানুষ হয়ে গেছে। চারতলা-পাঁচতলা নতুন নতুন সব অফিস বাড়ি উঠেছে। ওপারের চেহারা আগের মতই, এলুমিনিয়ামের হাঁড়িকুড়ি, কাপ-ডিশ-কেটলীর বেঢপ উটকো দোকান, তার পাশে

রঙিন কাগজের ফুল-ফিরি-করা চীনে মেয়ে। কে জানে মণিকার আর আসা হবে কিনা এ রাস্তায়, এ আফিসে হয়ত আর কোনদিন ঢোকারই দরকার হবে না, আরেকটি মানুষের সাথে রোজ হয়ত আর দেখা হবে না।

পায়ের সাড়া পেয়ে মণিকা মুখ ফিরিয়ে দেখল সাম্‌নে সুধীর।

সুধীর বলল, 'এই যে, আপনি এখানে—'

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে মণিকা বলল, 'থামলেন কেন, বলুন—আর আমি আপনাকে খুঁজে খুঁজে হয়রান।'

'কেন, খোঁজ খবর করিনি বুঝি।' আরক্ত মুখে সুধীর বলে।

করে বই কি। মণিকার জন্যে সুধীর অনেক করেছে। এখানকার চাকরির মূলেও তো সুধীর। খোঁজখবর এনেছে, যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছে। সুধীর আছে পায়ে পায়ে, ওর অফিসে আসতে দেরি হলে, কি বাইরে থেকে ফিরতে একটু দেরি হলে সুধীর নানা অছিলায় মণিকার খোঁজ ক'রে বেড়ায়।

সুধীর বলল, 'আমি কেন, যিনি খোঁজ করবার তিনিই করছেন। দাশগুপ্তের বেয়ারা এসে খবর নিয়ে গেছে তিন বার।'

মণিকা হেসে উঠল, 'তাই নাকি, তাহলে যাই একবার।'

সুধীরও হাসে সঙ্গে সঙ্গে, বলে, 'যান না'।

সুধীর জানে মণিকা তা যাবে না। খবরাখবর যা করবার করবে ওর মারফৎ। দাশগুপ্তের উৎপাতে এর আগে তিনটি মেয়ে-ষ্টেনো চাকরি ছেড়েছে পর পর। ওর কাণ্ড-কারখানা অফিসে কারো জানতে বাকি আছে নাকি। অফিস থেকে বাড়ি ফেরার পথে ওর হোটেল-বিলাসের খবর পর্যন্ত রাষ্ট্র হয়ে গেছে। যায় তো সুধীরকেই সঙ্গে নিয়ে যাবে মণিকা, একা যাবে না।

একা নয় দু'জনেই একসঙ্গে লিফ্‌টে ক'রে ফের নিচে নামল। গুমোট কেটে গিয়ে এতক্ষণে ফুরফুরে একটু হাওয়া দিচ্ছে। সুধীর আর মণিকা হাঁটছে একসঙ্গে, কিন্তু মণিকার গতি শ্লথ, চরণ চলতে চায় না।

তা দেখে সুধীর বলে, 'আজ আবার বুঝি হেঁটেছেন খুব, ঈস্‌ মুখে যেন কালি মেরে দিয়েছে। চলুন চা খাই।'

সুধীরের দরদটুকু ভারি ভালো লাগে মণিকার। ওর কপালে ঘাম দেখলে মুখ কালো দেখলে আর কে বলবে একথা? আগে মা বলতেন। আর এখন বলে এই সুধীর।

মণিকা খুশী হয়ে বলে, 'শুধু বুঝি চা?'

'আর কি খাবেন বলুন?'

'যা খাওয়াবেন সব।' আদুরে গলায় মণিকা জবাব দেয়।

কিন্তু চা ছাড়া আর কিছুই মণিকাকে খাওয়াতে পারে না সুধীর।

মণিকার আর কিছু চাই না, কাজ কি বাজে পয়সা খরচ ক'রে। আজ সুধীরের পয়সা, কিন্তু কাল যে সেই পয়সার দু'জনেই মালিক হবে না তাই বা কে বলল।

চা পর্ব শেষ ক'রে দু'জনে হাঁটতে হাঁটতে এসে বসল ডালহাউসি স্কোয়ারে। অনেক অফিস ছুটি হয়ে গেছে। স্কোয়ারের চারদিক ঘিরে কেরানীর কলস্রোত, মাঝখানে একান্তে শুধু ওরা দু'জন। আশেপাশে কেউ নেই। এ জায়গা ওদের বাঁধা। আরো কতদিন অফিসের পরে দু'জনে এসে এখানে বসেছে। কিন্তু আজ হাওয়া যেন একটু চঞ্চল। মেঘভাঙা আকাশে বড় রংয়ের আঁকি-বুকি। মনের কথা বলার এই তো সময়। মণিকা বল এবার তোমার মনের কথা, যে কথা বলি বলি ক'রেও এতদিন বলতে পারনি।

ঠোঁটে এসে ফিরে গেছে। কিন্তু শুরুর আগেও একটু ভূমিকা করতে হয়।

ক্লান্ত গলায় মণিকা বলে, 'চাকরি আমি ছেড়েই দেব সুধীরবাবু।'

সুধীর অবাক হয়, 'কেন!'

'ওঃ, ভারি তো আপনার চাকরি, মানও যায় পেটও ভরে না,' তারপর সুধীরের আরেকটু গা ঘেঁষে বসে মণিকা বলে ফিসফিসিয়ে, 'আর চিরকালই আমি বুঝি চাকরি করে যাব?'

সুধীর জিজ্ঞেস করল, 'তার মানে?'

মণিকা বলল, 'আহা, কিছুই যেন বোঝেন না। আমার বুঝি ঘর সংসার করতে হবে না, চিরকার কেবল চাকরি নিয়ে থাকলেই চলবে!'

এতক্ষণে বিষয়টা বোধগম্য হয় সুধীরের। চমকে ওঠে সে। কি বলছে মণিকা? সুধীর কি খুব বেশি এগিয়ে গেছে? এই একটু ধরা-ছোঁয়া, একসঙ্গে হেঁটে বেড়ান, তাতে এমন কি দোষ হয়েছে, এইটুকুর জন্যে ওর সব দায়িত্ব ঘাড়ে নিতে হবে। বিয়ে করতে হবে মণিকাকে!

এক মুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে কি ভেবে নেয় সুধীর। তারপর মণিকার চুড়ির ওপর আলতো হাত রেখে হেসে বলে, 'যা ভেবেছ তা হবার নয় মণি। এখানে মেসে থাকলে হবে কি। বাড়িতে আমার সব আছে। কিন্তু ওপথ ছাড়াও তো আমরা চলতে পারি, মিশতে পারি মণি। বিয়ে না ক'রেও চিরকাল একজন আরেকজনের বন্ধু হয়ে থাকতে পারি।'

সব আছে! সুধীরের সব আছে। ঘর-সংসার, ছেলে-বউ সব, অথচ একদিনের জন্যেও মণিকা তা জানতে পারেনি। আচমকা চাবুক

খেয়ে এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে থাকে মণিকা, তারপর হঠাৎ মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হেসে ওঠে।

'ও মা, আমি বা কি বললাম, আর আপনি বা কি বুঝলেন। আমি বুঝি ওসব কথা বলেছি? কি লজ্জা মাগো—নিন হাত ছাড়ুন।' তড়িৎ বেগে মণিকা উঠে দাঁড়ায়, সুধীরের জন্যে ও আর দেরি করে না। পিছন ফিরে তাকায় না একবার। আস্তে আস্তে পা ফেলে চলে আসে অফিসের সাম্‌নে, একেবারে লিফ্‌টের মুখে। লিফ্‌টে উঠতে গিয়ে এবারেও ওর পা জড়িয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সেকি শুধু ক্লান্তিতে! ক্লান্তির সঙ্গে ভাবনা। সব ফুরিয়ে যাওয়ার ভাবনা। অফিসে, বাড়িতে, একা একা রাস্তায় পথ চলতে চলতে কতদিন কত অসম্ভব সব ভাবনা ভেবেছে মণিকা। কত স্বপ্ন দেখেছে। বিয়ের পরে সুধীর কোথায় নিয়ে তুলবে, কেমন বাড়ি-ঘর সুধীরের, কে কে আছে সংসারে। আজ জানল সুধীরের সব আছে, আর মণিকার! কি রইল মণিকার?

কাজের মানুষ দাশগুপ্ত। অফিস শেষ হলেও ওর কাজ শেষ হতে চায় না। সেকশন ফাঁকা ক'রে দিয়ে সবাই প্রায় চলে গেছে, শুধু দাশগুপ্ত এখনও তার ফাইলপত্রের মধ্যে বন্দী। মণিকা ওর দোরের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবল একটু। ওর তো আজ চিরকালের মত ছুটি হয়ে যাবে এ অফিস থেকে। এখনি চলে যাবে, আর আসবে না কোনদিন। এলেই তো আবার সুধীরের সঙ্গে দেখা হবে, মুখোমুখি হবে দু'জনে। না, তা যেন আর কোনদিনই না হয়। তা চায় না মণিকা, হঠাৎ মণিকার মনে হ'ল, যাওয়ার আগে দাশগুপ্ত সায়েবকে একটু নাচিয়ে গেলে ক্ষতি কি? ওর গাড়িতে চেপেই তো বাড়ির পথটুকু পাড়ি দেওয়া যায়। অবসাদে

হাত-পা যেন অবশ, আড়ষ্ট হয়ে আসছে। এখন আর ট্রাম-বাসের ভিড় ঠেলার কথা মনেও আনতে পারছে না মণিকা। আস্তে আস্তে দরজা ঠেলে ও গিয়ে ঘরে ঢুকল। সাম্‌নে তাকিয়ে খুশিতে যেন ভেঙে পড়তে চায় দাশগুপ্ত। হয়ত মনে মনে উচ্চারণ করল, সুখদা স্বয়মাগতা, মুখে বলল, 'আসুন, বেয়ারা পাঠিয়েছিলাম আপনার খোঁজে। বাইরে ঘোরার কাজে দিয়েছি। অষ্টপ্রহর ভাবনায় থাকতে হয়। আমাদেরও তো একটা দায়িত্ব আছে মিস. সেন।'

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে ওর চোখের দিকে তাকাল মণিকা। তা ঠিক। দাশগুপ্তের আজও সেই প্রথম দিনের সাজ। যেদিন মণিকা ওর সাম্‌নে দাঁড়িয়ে ইন্‌টারভিউ দিয়েছিল, চোখ নামিয়ে, ভয়ে ভয়ে। মোটা ভুরুর নিচে ঈষৎ ছোট শয়তানি-ভরা এক জোড়া চোখ। গায়ে ফিকে নীল রংয়ের হাওয়াইন শার্ট, রোমশ কব্জিতে রূপোর চওড়া ঘড়ির ব্যাণ্ড চকচক করছে। আশ্চর্য! বয়স পঞ্চাশ ছুঁয়েছে তবু সখ মিটতে চায় না। লোভ যেতে চায় না।

গলায় আকুতির সুর এনে মণিকা বলে, 'আজ ভারি ক্লান্ত হয়েছি হেঁটে হেঁটে। ভাবছিলাম কি, আপনার যদি খুব অসুবিধা না হয়, তাহলে আপনার গাড়িতে ক'রেই—'

বাধা দিয়ে দাশগুপ্ত বলল, 'না না, অসুবিধা কি। এতো আমাদের ডিউটি, আমাদের কর্তব্য। বাড়ি পৌঁছে দেব বৈকি।'

ফাইলপত্র ঠেলে রেখে চকিতে উঠে দাঁড়াল দাশগুপ্ত।

ওর পিছনে পিছনে মণিকা গিয়ে গাড়িতে উঠে বসল। মণিকা আরামের নিঃশ্বাস ছাড়তে পারছে এতক্ষণে। আঃ। গাড়ির গদির মধ্যে ওর অর্ধেক দেহ ঠেসে গেছে। গদি তো নয় যেন কারো কোলে দেহ এলিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়েছে মণিকা। চুপচাপ পড়ে থাকতে বড়

ভাল লাগছে ওর। কিন্তু দাশগুপ্ত এবার শুরু করে, গাড়ি চড়ার মাশুলটা বুঝি আদায় ক'রে নিতে চায়। গাড়ির সিটে মাথা ঠেকিয়ে দাশগুপ্ত বলে, 'হ্যাঁ, মাঝে মাঝে লিফ্‌ট দিতে পারি নাতো কি? গাড়ি তো আপনাদের জন্যেই, তবে কি জানেন আফিসের ছোঁড়া-গুলোর চোখে পড়লে হয়ত পাঁচ রকম কথা তুলে বসবে। অবশ্য তারও বিহিত আছে—'

'কি বিহিত?' মণিকা বলল আস্তে আস্তে।

মুখ ফিরিয়ে দাশগুপ্ত বলল, এদিক ওদিক ঘুরেটুরে রোজ ঠিক সন্ধ্যার পর যদি আসেন আমার ঘরে তাহলে বেশ হয়। দু'জনে ফেরা যায় একসঙ্গে।'

মণিকা বলল, 'হুঁ'।

দাশগুপ্ত মুখ ফেরাবার সঙ্গে সঙ্গে একটা ঝাঁঝাল গন্ধ এসে নাকে লাগছে মণিকার। গন্ধটা যে কিসের মণিকার বুঝতে বাকি থাকে না, আশ্চর্য, অফিসে বসেও মদ খায় নাকি লোকটা?

গাড়ি এগিয়ে চলল। মৌলালির মোড় পেরোলেই তো ওদের বাসা। মোড় থেকে সামান্য একটু রাস্তা। কতদিন এই পথটুকু হেঁটে এসেও মণিকা এক সেকশনের ট্রামের পয়সা বাঁচিয়েছে, অল্প একটু পরেই ওরা মৌলালির মোড়ে এসে পৌঁছল। এবার গাড়ি থামাতে বলতে হয়, থামতে বলতে হয় দাশগুপ্তকে। কিন্তু সোজা হয়ে উঠে বসে মণিকা থামতে বলতে পারছে কোথায়? দাশগুপ্ত ওকে কোথায় নিয়ে চলল? বাড়িতে, নাকি সেই হোটেলে, যে হোটেলের কথা অফিসে সে শুনেছে অনেকদিন। সব জেনে, সব বুঝেও মণিকা ওকে থামাতে পারল কই? আয়েসে দেহ অবশ হয়ে আসছে, আরামে চোখ ঢুলে আসছে মণিকার।

বাণিজ্য

কানের কাছে মৃদু একটু আবেদন, ভ্রমর গুঞ্জনের মত, 'সরু চিরুনি দেব একটা, ফাইন চিরুনি?' চমকে মুখ তুলে তাকাল নীলিমা। ও, সেই ক্যানভাসার ভদ্রলোক। আগে ভেবেছিল কে না কে। প্রফুল্লকে কিন্তু ক্যানভাসার ব'লে হঠাৎ ধরবার উপায় নেই। গায়ে চুড়িদার মুগার পাঞ্জাবি, পায়ে ব্রাউন রংয়ের কাবলি, চোখে চশমা, রীতিমত ভদ্র বেশ। কি করবে, পেটের দায়ে কতজন আজ পথে নেমেছে। কিন্তু ভাল দিনে ওর কাছে চিরুনি বেচতে এসেছে প্রফুল্ল। এই একটু আগে নীলিমা টাইপ-রাইটিং ক্লাসে ইতি দিয়ে এল। কি হবে ওসব শিখে? চাকরি যাদের হবার হচ্ছে, হবে। নীলিমার কিছু হবে না। অনর্থক মাসে মাসে কয়েকটা টাকা দণ্ড দেওয়া। প্রফুল্লের সঙ্গে আলাপ একটু আছে বৈকি নীলিমার। টাইপ-রাইটিং ক্লাসে যাওয়া-আসার পথে এক একদিন এক নতুন বেসাতি নিয়ে প্রফুল্ল এসে সাম্‌নে দাঁড়িয়েছে। ওর টেকনিকটা নতুন। ঝোলা-ঝুলির বালাই নেই, পাঞ্জাবির তুটো পকেট সম্বল শুধু। বাছাই-করা শৌখীন কয়েকটা জিনিসের পরিমিত ষ্টক। হিসেব ক'রে মানুষ চিনে চিনে প্রফুল্ল গিয়ে সাম্‌নে দাঁড়ায়, ওর জিনিসগুলি পরখ ক'রে দেখবার অনুরোধ করে। কবে একগজ সিল্কের ফিতে নিয়েছিল নীলিমা, তার জের আজও মেটেনি। প্রফুল্ল আশায় আশায় ঘোরে। কতদিন নীলিমার মনে হয়েছে কিছু কিনতে পারলে ভাল হয়, ওর অন্তত তুটো পয়সা

থাকে। কিন্তু পারা যায় কই। হিসেব করা ট্রেণ-ফেয়ার। বেলঘরিয়া থেকে বৌবাজার ষ্ট্রীটের এই ইস্কুলে এসে টাইপ শিখে ফিরে যাওয়া পর্যন্ত আট আনা পয়সা মাত্র বরাদ্দ। তা থেকে বাজে খরচ করা যায় না। নীলিমা সংক্ষেপে জবাব দিল, 'না, চিরুনি চাইনে।'

কিন্তু চাই না বললেই খদ্দের ছেড়ে দিলে প্রফুল্লর চলে কি ক'রে। চিরুনি ছাড়াও তো জিনিষ আছে। পাশে পাশে আরো খানিকটা এগিয়ে গিয়ে প্রফুল্ল বলে, 'তাহলে কাঁটা, রূপোর ঝুরিকাঁটা দেই ক'টা। ভারি সস্তা কিন্তু। ছ' আনা জোড়া।'

'থাক, দরকার নেই।'

প্রফুল্ল হেসে বলে, 'দরকার আছে, নেবেন না, নেবার মন নেই তাই বলুন।'

অজান্তে বুঝি খোঁপায় একবার হাত পড়ে নীলিমার। হেসে জবাব দেয়, 'ওই হ'ল। দরকার তো কত জিনিসেরই থাকে। তাই ব'লে কি সব সময় সব জিনিস কেনা যায়?'

'তা ঠিক। কিন্তু কি আশ্চর্য দেখুন। যাদের পরলে মানায় তারা পরবে না। অথচ চুল উঠে উঠে যাদের খোঁপা এসে গুটি-খোঁপায় দাঁড়িয়েছে তারা পরে। এমন চমৎকার খোঁপা আপনার, অথচ কম ক'রে তিন দিকে তিনটে কাঁটাও নেই।'

নীলিমা থমকে দাঁড়াল। প্রফুল্লর একি শুধু কাঁটা বেচার ওকালতি? আর কিছু নয়? দু'বছর আগে হ'লে এইটুকুতেই ভয় পেয়ে যেত নীলিমা, বুক দুরুদুরু করত। মুখ বুজে এড়িয়ে যেত সন্তর্পণে। কিন্তু এখন আর ভয় করে না। চলতে-ফিরতে ওরকম কত শুনতে হয়, কত ইঙ্গিত-ইশারা চোখে পড়ে। তা নিয়ে মাথা ঘামানো চলে না। বৌবাজারের গির্জায় ঘড়ির দিকে নীলিমা

তাকিয়ে দেখল একবার। একটু জোরে হেঁটে গেলে বারটা ছত্রিশের ট্রেনটা এখনও ধরা যায়। কিন্তু কী হবে তাড়াহুড়ো ক'রে। কলকাতার সাথে আসল সম্পর্ক ত আজ শেষ হ'ল। কে জানে আবার কবে আসা হয়ে উঠবে। হঠাৎ প্রফুল্লের জন্যে কেমন যেন একটু মায়া লাগে নীলিমার। আসলে তো একই পথের পথিক। আহা দু'টো পয়সা রোজগারের আশায় কতরকমই মানুষকে করতে হয়।

'আমার খোঁপা বুঝি খুব ভাল দেখছেন?' নীলিমা হাসতে থাকে।

'শুধু কি খোঁপা?'

'তবে আর কি?'

'আর—' প্রফুল্ল প্রশ্রয় পেয়ে ব'লে ফেলে, 'আর আশ্চর্য আপনার চোখ।'

একটুকাল আরক্ত হ'য়ে রইল নীলিমা। আড়চোখে একবার প্রফুল্লর দিকে চেয়ে দেখল। হয়ত সবটুকুই প্রফুল্লর ভান নয়, ছলনা নয়।

নীলিমা বলল, 'ও, বুঝেছি এবার আপনি সুর্মার কৌটো বার করবেন।'

লজ্জিত হ'য়ে প্রফুল্ল বলল, 'না, সুর্মা-টুর্মা নেই। আজকের আইটেম শুধু দু'টো।'

কিন্তু দু'টো আইটেমে ভর ক'রেই অনেক দূর এগিয়ে এল প্রফুল্ল। নীলিমার সাথে সাথে শিয়ালদ'র নর্থ স্টেশন পর্যন্ত।

জ্যৈষ্ঠ মাসের চড়া রোদে শিয়ালদ' পুড়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে একেক ঝলক গরম হাওয়া এসে গায়ে লাগছে। নর্থ স্টেশনকে এখন মনে হচ্ছে মরুভূমির মধ্যে ওয়েসিসের মত। সকালের সে ভিড় মিটে

গেছে। কোণের চায়ের স্টলটায় কে একজন চা খেয়ে কাপ নামিয়ে রাখল, টুং ক'রে তার একটু মিঠে শব্দ কানে এল। বেঞ্চির ঠেসের উপর কনুই রেখে ঘনিষ্ঠ হ'য়ে ঘুরে বসল প্রফুল্ল, বলল আস্তে আস্তে, 'বেশ তো টাইপ শিখছিলেন, হঠাৎ ছেড়ে দিলেন কেন।'

'কি হবে শিখে, টাইপ শিখলেই আজকাল চাকরি হয় না। আসলে মুরুব্বির জোর চাই।'

প্রফুল্ল ম্লান হেসে বলল, 'মুরুব্বির জোর থেকেও তো আমার কিচ্ছু হ'ল না।'

নীলিমা বলল, 'যাহোক, যা করছেন এতে তো চলে যায়।'

'চলে কোনরকমে। কিন্তু এসব আর ভাল লাগে না। ভেবেছি—' প্রফুল্ল পকেট থেকে সিগারেট বার ক'রে দেশলাইয়ের ওপর ঠুকতে থাকে, 'ভেবেছি এসব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে দোকানই দিয়ে বসব একটা, যা থাকে বরাতে।'

'হ্যাঁ, সেই ভাল।' নীলিমা সায় দেয়, যেন সে-দোকানে ওরও ভাগ আছে।

কথায় কথায় বারটা ছত্রিশ কখন চলে গেছে, নীলিমার খেয়াল হয়নি কিন্তু একটা চল্লিশের ট্রেনটা ছাড়লে চলবে না। নীলিমা চিবুক উঁচু ক'রে স্টেশনের ঘড়ি দেখে।

যাওয়ার মুহূর্তে এক অদ্ভুত প্রস্তাব ক'রে বসল প্রফুল্ল।

বলল, 'চলুন, আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।'

'ওমা, আপনি যাবেন কোথায়!' নীলিমা অবাক হয়।

'চলুন, না হয় স্টেশন থেকেই ফিরে আসব।'

'না না, আজ নয়, আজ থাক।' যেতে হয় আর একদিন যাবেন। নীলিমা শঙ্কিত হয়ে ওঠে।

কিন্তু প্রফুল্লকে ফেরাতে পারলে তো। নিজেই গিয়ে দু'খানা টিকিট কেটে নিয়ে এল। একটু ফাঁকা দেখে কামরা ঠিক করল, তারপর নীলিমার সাথে ট্রেনে উঠে বসল।

স্টেশন থেকে দু'পা বাড়িয়ে যা দেখে তাই ভাল লাগে প্রফুল্লর। আঃ, এ কোন্ স্বর্গরাজ্যে এল প্রফুল্ল! সেই কালো জলের পুকুর, কলাগাছ, নারকেল গাছ, কতকাল এসব দেখা হয় না। চোখ যেন আর ফিরতে চায় না। কিন্তু এতক্ষণে ভয় হয়, বুক দুরু দুরু করে নীলিমার। বাবা মিলে চাকরি করেন। কাঁটায় কাঁটায় চারটেয় ফিরে আসবেন। চারটের অবশ্য এখনও বেশ দেরি আছে। কিন্তু ভয় তো কেবল বাবাকেই নয়। আশেপাশে হাজার জোড়া চোখ পাতা আছে। চেনা চোখ। এতো কলকাতা নয়, বেলঘরিয়া। প্রফুল্লর পাশে পাশে ভয়ে ভয়ে হাঁটে নীলিমা। পারে তো আঁচল দিয়ে আড়াল ক'রে রাখে। কি জানি কে দেখে বসবে।

একটা কেন দু'টো পথেরই খোঁজ পেয়ে গেছে প্রফুল্ল। বেলঘরিয়া বাসেও যাওয়া যায়। শ্যামবাজার থেকে কয়েক পয়সার মামলা। কিন্তু দুপুরের এই দু'টি ঘণ্টায় কি কারো মন ভরে? একটু বেশি সময় নিয়ে একটা পুরো দিনের জন্য যদি পাওয়া যেত নীলিমাকে।

ওর হাত থেকে চায়ের কাপ নিতে নিতে প্রফুল্ল বলল, 'আবার এসো না একদিন কলকাতায়। ওপথ তো তুমি ছেড়েই দিয়েছ।'

'ছাড়ব না তো কি? তোমার মত অত পয়সার জোর নেই আমার।'

'হ্যাঁ, পয়সার জন্যেই যেন তোমার যাওয়া আটকে আছে।' কোঁচার খুঁটে মুখ মুছে প্রফুল্ল বলে।

'তবে কিসের জন্যে ?'

'আসলে যাওয়ার মন নেই। ছুটাছুটি ক'রে আমি এলে তবে আমার কথা মনে পড়ে। মুখ ভার হয় প্রফুল্লর।

সলজ্জ হেসে নীলিমা বলে, 'তাই বুঝি ?'

'তবে কি ?'

'এমনি যাওয়া হয়ে ওঠে না, এবার ঠিক যাব একদিন।'

ইচ্ছা থাকলেও যাওয়া যে কেন হয় না সে কথা তো প্রফুল্লকে বুঝান যাবে না, বলা যাবে না, এখন তো আর নীলিমার ইস্কুল নেই ! এখন কি দরকার ওর কলকাতা যাওয়ার। কলকাতা যেতে হলে ওকে হাজার রকম কৈফিয়ৎ দিতে হবে।

পয়সার ভাবনাটা যে ওর নয়, নীলিমা তা জানে। পয়সার জন্যে কোন্‌টাই বা আটকে থাকছে। প্রথম দিন প্রফুল্ল যে কাঁটা দিয়ে গেছে তারও তো দাম নেওয়াতে পারল না নীলিমা। কিন্তু সে-কাঁটাই বা নীলিমা খুশিমত একদিন পরতে পারল কই। ছোট ভাই বিলুটা আছে তক্কে তক্কে। দেখে ফেললে আর উপায় থাকবে না। বাবার কাছে রিপোর্ট যাবে। হিসেব দিতে হবে কাঁটা এলো কোথা থেকে, এল কার পয়সায়। তার চেয়ে সে-কাঁটা ব্যাগেই ভরা থাকুক। সুখের চেয়ে সোয়াস্তি ভাল। কিন্তু অত সহজেই কি স্বস্তি পাওয়া যায়। মন খুঁত খুঁত করে না ?

দিন তারিখ ঠিক হ'ল। সেই ভাল, নীলিমা আরেকদিন যাবে কলকাতায়। সব খরচ প্রফুল্লের। আর সকাল দশটা থেকে চারটে পর্যন্ত সব দিনটুকু তার। তবু জায়গার সমস্যা মিটতে চায় না। এমন একটু জায়গা কোথায় কলকাতায় যেখানে নিরিবিলিতে, আর পাঁচজনের চোখের আড়ালে বসে দু'টো কথা বলা যায়।

থাকবে না কেন, আছে। ফিকির ফন্দী সবই জানা আছে প্রফুল্লর। দু'জনে চলে যাও আলিপুর চিড়িয়াখানায় যতক্ষণ খুশি বস, ঘুরে বেড়াও। কেউ দেখবে না, দেখলেও কেউ চিনবে না। আবার সময় মত ফিরে এলেই হ'ল।

মাঝখানে মোটে তিনটি দিনের সময় নিয়েছিল প্রফুল্ল। তিন দিন যদিবা কাটল, আজকের সকাল বুঝি আর কাটে না। খেয়ে দেয়ে বাবা বেরোলেন তো—বিলুর ইস্কুলের সময় আর হয় না।

অনেকক্ষণ বাদে বিলু ইস্কুলে গেল। ও বেরিয়ে যাওয়ার পর নীলিমা কাপড় বদলে নিয়ে চুল বাঁধল, ব্যাগের মধ্যে কাঁটাগুলির ওপর হাত রেখে কি একটু ভাবল। থাক এখন পরে কাজ নেই। যাঁর কাঁটা সেই নিজে হাতে পরাবে। একা ঘরেই কেমন লজ্জা করতে থাকে নীলিমার। যাওয়ার আগে মনোরমা এসে সাম্‌নে দাঁড়ালেন। বললেন, 'কোথায় চললি নীলু?'

মাকে নীলিমার ভয় নেই। তবু একটু ছলনা করতে হয়, মিথ্যে করে বলতে হয়, 'কলকাতায় একটা চাকরির কথা হচ্ছে মা।'

মনোরমা খুশি হয়ে ওঠেন, ভাবেন, আহা যাক, নীলুর একটা চাকরি হলে বেশ হয়। টানাটানি ঘোঁচে সংসারের। মনোরমা বললেন, 'ও, সেই যে ছেলেটি আসে যায় সেই বুঝি খোঁজ এনেছে?'

নীলিমা মাথা নাড়ে। তারপর আস্তে আস্তে বেরিয়ে যায়।

প্রফুল্লর বাড়ির নম্বর খুঁজে পেতে দেরি হয় না নীলিমার। এখন মনে পড়ে, এ রাস্তায় ও আরেকদিন এসেছিল। এসেছিল এক বান্ধবীকে এগিয়ে দিতে। চেনা গলি। নম্বর মিলিয়ে নীলিমা এসে

বাড়িটার সামনে দাঁড়াল। কিন্তু কড়া নাড়ার আর দরকার হলো না। প্রফুল্লও কি ঘড়ি ধরে বসে ছিল? হিসেব করে রেখে ছিল ঠিক এই মুহূর্তে নীলিমা এসে দরজায় দাঁড়াবে?

দরজা খুলে প্রফুল্ল বলল, 'ও তুমি? চলো।'

দু'জনে এগোতে থাকে। কিন্তু বৌবাজারের মোর পর্যন্ত না এসে কথাটা ভাঙে না প্রফুল্ল।

বাসস্ট্যাণ্ডে এসে থেমে দাঁড়িয়ে প্রফুল্ল বলে আস্তে আস্তে, চোরের মত, 'চাকরি পেয়েছি একটা। অবিশ্যি এমন ভাল চাকরি কিছু নয়। তবু ছাখো কি যন্ত্রণা, তুমি এলে, আর আমার এদিকে সময় নেই, এক্ষুনি ছুটতে হচ্ছে। যাকগে আরেক দিন যাওয়া যাবে, এসো কিন্তু আরেকদিন।'

যন্ত্রণা ছাড়া কি? নীলিমা ভাল করে ওর দিকে তাকাল। সেই যন্ত্রণায় প্রফুল্লর মুগার জামায় ইস্ত্রি পড়েছে, লুকোতে চাইলেও পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে প্রফুল্লর সারা মুখে সেই যন্ত্রণার ছাপ। ওর মুখে পান। হাতে চুনের বোঁটা। কিন্তু প্রফুল্লর সত্যি আর দেরি করলে চলে না। চুনের বোঁটাটা ফেলে দিয়ে সে হাত বাড়িয়ে বাসের হ্যাণ্ডেল ধরল। ফিরে তাকিয়ে বলল, 'চলি, কেমন? রবিবার-টার করে এসো একদিন।'

এই সাড়ে দশটায়ই অসহ্য গরম রাস্তায়। এবার বুঝি আর বৃষ্টি নামবে না কলকাতায়।

প্রফুল্লর ফেলে দেওয়া চুনের বোঁটাটার দিকে একটু কাল চেয়ে রইল নীলিমা, তারপর তাকাল স্টেশনের দিকে। আবার চার আনা খরচা ক'রে ফিরে যেতে হবে। কতগুলি পয়সার শ্রাদ্ধ হ'ল শুধু।

ব্যাগের মধ্যে প্রফুল্লর দেওয়া কাঁটাগুলি হাতে ঠেকছে নীলিমার। একবার ভাবল ওগুলি ছুঁড়ে ফেলে দেয় রাস্তায়, আবার ভাবল, আচ্ছা কাঁটাগুলি বেচে দেওয়া যায় না? কেউ নেয় না? যদি প্রফুল্লর মত ক'রে কারো কানের কাছে গিয়ে বলে নীলিমা?

নকল সিল্ক

এগার টাকার নকল সিল্ক। ধোপে ধোপে ইজ্জত ধুয়ে গেছে অনেকদিন, পাড়ের ফুল-পাতা জলে একাকার। আসল রংটা এখন আর চেনা যায় না। কিন্তু হ'লে হবে কি? পোষাকী কাপড় বলতে ঐ একখানা। বাইরে বেরোতে হ'লে ঐখানাই ইজ্জত বাঁচায়, আবার বাইরের কেউ আচমকা ঘরে এসে উঠলে সযত্ন অবহেলায় ঐ শাড়িখানাই কোমরে জড়ায় অঞ্জলি। এটাকে ছিঁড়ে শেষ না করা পর্যন্ত যেন ওর স্বস্তি নেই, এমনি একটা ভাব দেখায়। আঁচলের খুঁট দিয়ে অঞ্জলি চোখের কোল মুছল, গালে কপালে দুটো ঘষা দিল, তারপর এসে দাঁড়ালো উঠোনের মাঝখানে। আগন্তুক এসেছে একজন, ভবতোষের চোখেমুখে সেই দুঃসংবাদ। অঞ্জলির কি তা টের পেতে বাকি আছে, না দরজার আড়াল থেকে তাকে দেখা বাকি আছে এখনও?

বাবার মুখের দিকে চেয়ে অঞ্জলি বলল, 'মাসের মাঝখানে আবার কাকে ডেকে আনলে, এখন আমি চা দিই কি দিয়ে বলত?'

'কথা সেটা নয়।' সামান্য একটু হাসল ভবতোষ।

'তবে কি?'

'আমার মনে হয় সুকুমার টাকার কথা পাড়বে। সারা পথ ওকে একথা সেকথায় ভুলিয়েছি। কিন্তু বাসা পর্যন্ত যখন এসেছে তখন যাওয়ার আগে একবার শেষ কামড় দিয়ে যাবে।' .

অঞ্জলি হেসে বলল, 'সারা পথ যখন ঠেকিয়েছি, তখন বাসায় আর ওকথা মুখে আনতে দেব না, তুমি ভেব না।'

ভাবনা দূর হ'ল ভবতোষের। এখন আর কাউকে পরোয়া করে না ভবতোষ। পনের টাকার মহাজন সুকুমার দত্তকেও না। এক অফিসে কাজ করলে, ঠেকায় জোকায় অমন দু'দশ টাকা ধার দিতে হয় না ত কি? বিশেষত সুকুমারদের মত ছেলে-ছোকরাদের। ওদের খরচ কম, ঝামেলা কম। অবশ্য টাকাটা পড়ে আছে মাস তিনেক ধরে। কিন্তু ওসব পেটি এমাউন্ট মনে রাখার মত মেজাজ ভবতোষের নয়। নিজের সংসারের খরচ-খরচার হিসেবই সে কত মনে রাখে! মাস অন্তে টাকাটা এনে মেয়ের হাতে তুলে দেয়, ব্যস্। ভবতোষের মাথার মধ্যে জটিল জমা-খরচের হাজার অলি-গলি। সুকুমারকে কতদিন শুনিয়েছে, 'জান সুকুমার, তোমাদের মত পাশ-পরীক্ষার সুযোগ আমাদের কপালে ঘটেনি, কিন্তু ষোল বছর বয়সে এই হাত ডাবল এন্ট্রির লেজার মিলিয়েছে।' সুকুমার-দের দেনার ভাবনা ভাবার জন্য ভবতোষের মগজের সৃষ্টি হয়নি। কিন্তু ভাবে আরেকজন। সুকুমারকে নিয়ে এই তিন নম্বর। এর আগে দু'জনকে ফিরিয়েছে অঞ্জলি।

দুধওয়ালার এ মাসের বিল মেটান হয়নি। আগের মাসেরও সামান্য কিছু বাকি আছে। দুপুরবেলা তার সাইকেলের বেল বেজে উঠলো। মাইনে না পাওয়া পর্যন্ত টাকা মিটানো যাবে না এ কথাটা সৌদামিনী রান্নাঘর থেকে শুনিয়ে দিতে পারতেন বা ছেলে-মেয়েদের কেউ চেঁচিয়ে বলতে পারত, কিন্তু তা কেউ বলল না, সবাই জানে সে ভার বড় মেয়ে অঞ্জলির ওপর। অবশ্য অঞ্জলিও ঐ একই কথা বলবে, কিন্তু তার বলার ধরন একটু আলাদা, বলবে একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মিষ্টি ক'রে যাতে পাওনাদার কিছু মনে না করে,

যাওয়ার আগে যাতে মন খারাপ ক'রে না যায়। যেন একটা ঢেউয়ের দোলা খেয়ে সামনে এসে দাঁড়াল অঞ্জলি, বলল, 'মাসভর জোলো দুধ খাইয়ে তার আবার এত কড়া তাগাদা কিসের শুনি?' কান নয় অঞ্জলির যেন চোখ দু'টোই জবাবটা শুনতে চায়। অনুযোগটা মিথ্যা। দুধওয়ালা বলতে যাদের বুঝায় অমূল্য সে দলের নয়, ভদ্রঘরের ছেলে। লেখাপড়াও কিছুটা জানে। সম্প্রতি দুধের ব্যবসায় নেমেছে। পাড়ায় তার দুধের সুনাম আছে।

হেসে বলল অমূল্য, 'আজ টাকাটা দেবেন না এই তো?'

অঞ্জলি জবাব দিল, 'আজ নয়, কাল নয়, পরশুও নয়। পাবেন সেই দশদিন পরে। বাবা মাইনে পেলে পর। তারিখটা একটু লম্বা মনে হচ্ছে তাই না?'

হলেও তা মুখ ফুটে বলার জায়গা এটা নয়, অমূল্যকে আবার একটু হাসতে হয়। এ বাড়িতে চড়া আওয়াজ চলে না। টাকা সময় মত আদায় না হলেও সময়ে অসময়ে চা জোটে, মন মেজাজ বিগড়ে গেলে দুদণ্ড প্রাণের কথা শোনাবার লোক পাওয়া যায়।

মাথা নিচু ক'রে অমূল্য ফের গিয়ে সাইকেলে উঠল।

কিন্তু অমূল্য গেল তো এল গুলওয়ালা। তার পাওনা আড়াই টাকা। বর্ষাবাদলের দিন। মাসেরটা একদিনে কিনে রাখতে পারলে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। তাই ব'লে দামটা তো আর নগদই দিয়ে ফেলা যায় না। ছোঁড়ার চেহারা দেখলে পিত্তি জ্বলে যায় অঞ্জলির। কয়লার গুল বেচে ব'লে কি গায়েও কয়লা ঘষে রাখতে হবে! আর গলার স্বরটিও তেমনি। 'গুল নেবেন—' তিরিশ দিন গলির পথে ওর ন্যাকা সুর শুনে একবার নকল না ক'রে, না ভেংচিয়ে থাকতে

পারে না অঞ্জলি। সাম্‌নাসাম্‌নি পেয়ে ওকে অঞ্জলি কষে ধমক লাগাল—

'যাঃ ভাগ, ভাগ বলছি, কাল গুল দিয়ে আজই টাকা। ওর জন্যে হাতের ওপর টাকা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি কিনা!' পরক্ষণেই কি ভেবে অঞ্জলি ওকে ডেকে ফিরাল, 'এই শোন!' ও তো অমূল্য নয়। দোরের বাইরে গিয়েই হয়ত চেঁচামেচি শুরু ক'রে দেবে। লোক জানাজানি ক'রে ছাড়বে। ঘরে গিয়ে হাতের মুঠোয় একটা আনি নিয়ে এসে অঞ্জলি ওকে বলল, 'চোখ বোজ, চোখ বুজে হাত পাত দেখি।' কিন্তু গুলওয়ালা চোখ বুজবে কেন? চোখ বুজলে আর দেখবে কি? একটু আগের অঞ্জলির সে রাগ কোথায় উড়ে গেছে, বাঁকা ভুরু, সোজা হয়েছে। কেমন হাসি হাসি ঢল ঢল একখানা মুখ।

ওর হাতের ওপর আনিটা ছেড়ে দিয়ে অঞ্জলি বলল, 'তোকে চা খেতে দিলাম। ভয় নেই, এটা তোর হিসাব থেকে কাটব না। টাকাটা আসছে হপ্তায় নিয়ে যাস্‌, কেমন?'

এক হাতে চায়ের কাপ অন্য হাতে অমলেটের ডিস নিয়ে ঘরে ঢুকল অঞ্জলি। তারপর সুকুমারের সাম্‌নে সেগুলি নামিয়ে রেখে হেসে বলল, 'আপনার কথা বাবার মুখে এত শুনেছি, হঠাৎ এসেছেন ব'লেই যে অবাক ক'রে দেবেন ভাবছেন তা পারবেন না।' চিবুক দুলিয়ে অঞ্জলি আরেকবার নিঃশব্দে হাসল একটু, কাঁধের শাড়ি গুছিয়ে আরেকটু হেলে বসল। কিন্তু কে কাকে অবাক করে? সুকুমার নিজেই নির্বাক হয়ে গেছে। এ যেন ভাঙা ঘরে চাঁদের হাট। কিন্তু অবাক হলেও একেবারে থ মেরে যাওয়ার ছেলে নয়

সুকুমার। চায়ের কাপে আলগোছে একটু চুমুক দিয়ে সুকুমার বলল—

'কিন্তু কি আশ্চর্য দেখুন, ভবতোষদা কিন্তু আপনার কথা আমাকে একদিনও বলেননি। আপনি কেন, অবাক তো আমারই হবার কথা।'

প্যান্টের পকেট থেকে রুমাল বার ক'রে সুকুমার ঘাড় মুছল, তারপর পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে গুছিয়ে বসল। সুকুমারের দর্শন আলাদা। যাকে ভাল লাগে চোখে ধরে তাকে আড়চোখে নয়, দেখে চোখ মেলে সোজাসুজি। আড়চোখে চেয়ে লাভ? ছ'মিনিট পরে সাম্‌নে থেকে সরে গেলে সব মুছে যাবে। তখন লোভ হবে আবার দেখার, আপশোষ হবে ভাল ক'রে কেন চোখ তুলে দেখলাম না। অঞ্জলি কিন্তু চোখ তুলে তাকাতে পারছে না। এতক্ষণে ওর রাগ হচ্ছে শাড়িটার ওপর। ন্যাকড়ার মত পাত্‌লা এই শাড়িটা পরে না আসাই বুঝি ভাল ছিল। গায়ের ওপর ওটা থেকেও যেন নেই। সব দেখে নিচ্ছে সুকুমার। ওর রুমালের সেন্টের গন্ধে কেমন যেন নেশা লাগছে। গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে অঞ্জলির।

ম্লান একটু হেসে অঞ্জলি জবাব দিল, 'ভারি তো মানুষ আমি, আমার আবার একটা কথা—'

হাল্‌কা গলায় সুকুমার বলল, 'তাইতো।'

ভবতোষের পায়ের শব্দ শোনা গেল। বেশবাস বদলে নিশ্চিন্ত হয়ে এসে বসল ভবতোষ। অঞ্জলিও নিশ্চিন্ত হয়েছে। না, এরপরে আর টাকা পয়সার কথা তুলবে না সুকুমার। কিন্তু আরেকদিন কি আসবে সুকুমার? পেয়ালা-প্লেট গুছিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে সেই কথাই বলল অঞ্জলি—

'আসবেন কিন্তু আরেকদিন।'

সুকুমার বলল, 'আসব।'

আশ্চর্য বরাতজোর ভবতোষের। মাঝে মাত্র আর একদিন অফিস পালিয়ে সুকুমার এলো ভবতোষের বাড়িতে। এমনি বিকেলের দিকে। বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে সৌদামিনী যখন রান্নাঘরে বিব্রত, তখন। দ্বিতীয় দিনে সোজাসুজি ভবতোষকে জানাল, অঞ্জলিকে ও বিয়ে করতে চায়। বরাত ছাড়া কি? সুকুমারের মত ছেলে! ডিগ্রির জোরে ভবতোষের ডবল মাইনের চাকুরে। খুশিতে ইংরেজি বেরোল ভবতোষের মুখ দিয়ে—

'বাট্‌ ডোণ্ট্‌ বি আন্‌ইকনমিক মাই বয়! ইকনমিক্সের ছাত্র হয়ে বাজে খরচ করতে পারবে না।' মানে আমাকে বাজে খরচ করতে ব'লো না।

বাজে খরচ কাজের খরচ কোন খরচই অবশ্য ভবতোষের লাগল না। সব খরচ জোগাল সুকুমার। তারপর আচার-অনুষ্ঠান শেষ হ'লে অঞ্জলির হাত ধরে এসে ট্যাক্সিতে উঠে বসল। বাগবাজারের কানাগলি থেকে টালিগঞ্জের সদর রাস্তা। আর্যাবর্ত থেকে দাক্ষিণাত্য, একটু কি মন কেমন করল না অঞ্জলির? করল বৈ কি! কম রোজগেরে বাবা, খেটে খেটে কাঠিসার চেহারা মা, হিসেব ছাড়া বাড়তি কয়েকটা অপগণ্ড ভাই বোন। কিন্তু অঞ্জলিরও তো সাধ-আহ্লাদ আছে। এই আঠার বছর বয়স পর্যন্ত পরিখা হয়ে বাপের রাজ্য পাহারা দিয়েছে অঞ্জলি, সে বীরত্ব ও আর চায় না। সে গৌরবে ওর আর দরকার নেই।

অঞ্জলির হাতে একটু চাপ দিয়ে সুকুমার বলল, 'মন কেমন করছে, তাই না?'

'না, তুমি কাছে থাকতে মন কেমন করবে কোন্ দুঃখে?' সুকুমারের পাশে আরেকটু ঘন হয়ে বসল অঞ্জলি।

দু'দিক থেকে দুই ননদ এসে অঞ্জলির হাত ধরে গাড়ি থেকে নামাল। রীতা আর গীতা। ভারি হাসিখুশি, ভারি সুন্দর দেখতে। অঞ্জলির সমবয়সীই হবে। শাশুড়ীকে প্রণাম ক'রে উঠে দাঁড়াতেই রীতা বলল, 'যাই বল মা, দাদার কিন্তু নজরের বাহাদুরী আছে, দেখছ রং! দেখছ নাক চোখ!' তারপর অঞ্জলির কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস ক'রে বলল—

'সত্যি ক'রে বলতো ভাই, কি দেখে দাদা পাগল হয়েছিল। রং, না তোমার চোখ?'

ফিরে আসতে আসতে অঞ্জলি জবাব দিল, 'সে কি আমি জানি? তা শুনো তোমার দাদার কাছে।'

এ কোন্ রাজ্যে এসে উঠলো অঞ্জলি? সাজান গুছান তিনখানা শোবার ঘর। রান্নাঘর আলাদা। আলাদা ভাঁড়ার। সুকুমারের পৈত্রিক বাড়ি, ভাড়া গুনতে হয় না, মাসের শেষে বাড়িওয়ালা কড়া নাড়ে না। সুকুমারের নজর আছে ঠিকই। অঞ্জলি আসার আগেই ঘর সাজানো হয়ে গেছে। এসেছে নতুন ফার্ণিচার। মুখোমুখি বসে চা খাওয়ার জন্য সৌখিন চেয়ার, মাঝে চিকন কাজ করা টিপয়। পুরান খাটে নতুন বার্নিস লাগিয়ে জেল্লা ফিরিয়ে আনা হয়েছে। আর এসেছে কোমর অবধি গ্লাস বসান ড্রেসিং টেবিল। তার পাশে কাপড় কুঁচিয়ে রাখবার আলনা।

ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে চুল খুলে দিল অঞ্জলি, ধীরে সুস্থে বিনুনি ক'রে ফের খোঁপা বাঁধল। স্নো-পাউডারের কারুকার্য

শেষ করল, তারপর হাত বাড়াল শাড়ির জন্যে। খাটের ওপর আধশোয়া হয়ে সুকুমার তাকিয়ে তাকিয়ে সব দেখছিল, বাধা দিয়ে বলল—

'উঁহু তাঁত না, সিল্ক, সিল্কের শাড়িটাই পরে বেরোও। প্রথম দেখা সাজেই এ অভাগা আজ আরেকবার তোমাকে দেখতে চায়।'

অগত্যা সিল্কের শাড়িই পরতে হ'ল। আধমাথা ঘোমটা দিয়ে আঁচলটা বাঁ হাতের মুঠোর মধ্যে ধরে রইল অঞ্জলি, সর্ব অঙ্গে আশ্চর্য মসৃণ এক অনুভূতি। আঃ, কি নরম! সুকুমার তৈরি হয়েই ছিল, অঞ্জলি বলল, 'চল'।

কিন্তু বড় অসময়ে কোন বেরসিক যেন সদরের কড়ায় হাত দিয়েছে, এগিয়ে গেল সুকুমার। ওদের দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু সংলাপের সব কথা অঞ্জলির কানে আসছে। একটা কর্কশ চড়া গলার ধমকে সুকুমারের গলা চাপা পড়ে যাচ্ছে বার বার, সুকুমারের গলা কেন মিইয়ে আসছে?

'আশ্চর্য, ধাপ্পা দেওয়ার তুমি আর জায়গা পেলে না। একশ' টাকার একটা ফল্‌স্ চেক দিতে তোমার লজ্জা করল না সুকুমার? একশ' টাকার মুরোদ যার নেই তার আবার অত ফুটুনি কিসের? বাঁধা মাইনের কেরাণীর আবার ঘর সাজাবার সখ!'

'আঃ, আস্তে রণজিৎ, মাইনে পেয়েই—'

'থাম তুমি,' সুকুমার অবশ্য তার আগেই থেমে গেছে। কিন্তু রণজিৎ থামল না।

'মাসের কেবল সাত তারিখ, এর মধ্যেই মাইনের স্বপ্ন দেখছ, মাইনে পেয়েও তুমি ক'দিক সাম্‌লাবে তা আমার জানতে বাকি নেই। ওসব চলবে না। কিছু না নিয়ে আজ আমি যাব না।'

আয়নার সাম্‌নে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল অঞ্জলি। ওর শ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসছে। লোকটি কে?

সুকুমার ঘরে আসতেই অঞ্জলি প্রশ্ন করল, 'কে লোকটি?'

ম্লান হেসে সুকুমার বলল, 'পুরান বন্ধু, গোটাকয়েক টাকা দিয়ে বিদেয় করতে পারলে হ'ত, ভারি তো একশ' টাকার পাওনাদার।'

সুকুমার কয়েকবার পকেট হাতড়াল, ড্রয়ার টানল একবার, তারপর অঞ্জলির কাছে এসে ওর পিঠে হাত রাখল, বলল—

'যাক্‌, তুমি ভেবো না।'

মাথার আধখানা ঘোমটা, যেটুকু এতক্ষণ অঞ্জলির খোঁপায় এসে আটকেছিল সুকুমারের হাতের ছোঁওয়ায় সেটুকু পিছলে পড়ল কাঁধের ওপর। আর তো বাধা নেই। অঞ্জলির এ বেশ একেবারে বিয়ের আগের বেশ। বাপের বাড়ির বেশ। ভাবনা! এক টুক্‌রো হাসি ঝিলিক দিয়ে উঠল অঞ্জলির ঠোঁটে। ভাবনা ভাবতে হবে না? নিজেদের ভাবনা সুকুমারেরা আর কবে ভেবে ঠিক করতে পেরেছে? কিন্তু সুকুমারের এ সিল্কও বুঝি নকল সিল্ক!

মাথার কাপড়টা ফের আধখানা তুলে দিয়ে তাড়াতাড়ি গিয়ে দরজার পাশে দাঁড়াল অঞ্জলি। হেসে অভ্যর্থনা করল রণজিৎকে, 'ওমা, বাইরে দাঁড়িয়ে কেন—ভিতরে আসুন।'

সীমান্ত

বাধা দিতে গিয়ে প্রমীলা দরজার পাশে অবাক হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল। সাহেব-সুবো নয়, জোয়ান কোন পুরুষ মানুষ নয়, কয়েকটা ছোট ছোট ছেলেমেয়ে একটা নোংরা বেডিং গাড়ির মধ্যে ঠেলে তুলছে। জোরে ধমক দিলে তারা ফিরে যেত অথবা পা তুলে জুতোর ডগা দিয়ে বিছানাটায় আস্তে একটু ঠোক্কর মারত যদি প্রমীলা, তাহ'লে ওটা ওদের হাত থেকে গড়িয়ে একেবারে নিচে গিয়ে পড়ত। কিন্তু ওদের উদ্যোগ-আয়োজনের দিকে চেয়ে প্রমীলার এসব কথা মনেই এলো না। তার চোখের সাম্‌নে বেডিং-শুদ্ধ এই ক্ষুদ্র মানবকের দল ধীরে ধীরে উপরে উঠে এল। খুব যেন বাহাদুরীর কোন কাজ করেছে এমনি ভঙ্গি ক'রে হাত-পা ঝাড়া দিয়ে দাঁড়াল। ভারি কৌতুক বোধ করল প্রমীলা। বিভিন্ন বয়সের সাত-আটটি ছেলেমেয়ে, বেশ মোটাসোটা চেহারা, সাম্‌নে পিছনে মাথার দুদিকে সমান ক'রে চুল ছাঁটা। ছেলেগুলির পরণে খাট হাফ-প্যান্ট, গায়ে জামার বালাই নেই। কোনটার আবার প্যান্টের গিট কোমরের এলাকা ছাড়িয়ে নেমে পড়েছে নাভির অনেক নিচে। মেয়েদের গায়ে একই ডিজাইনের সস্তা ছিটের ফ্রক্। পোষাকের এইটুকু তারতম্য না থাকলে কোন্‌টা ছেলে, কোন্‌টা মেয়ে, চেনা কঠিন হ'ত হয়ত। চেহারায় এমনি একটা পাইকারীভাবে মানুষ হবার ছাপ সুস্পষ্ট।

প্রমীলা একবার ভাবল ছেলেমেয়েদের—কান্তি, দিলু, বুলাকে—ডেকে তোলে, ভারি মজা পাবে তারা, কিন্তু ভিড়ের চাপে কাল রাত্রে কারো ভাল ঘুম হয়নি—এই ফাঁকে ওরা একটু ঘুমিয়ে নিক্।

প্রমীলার নিজেরই বুঝি একটু মজা করার ইচ্ছে ছিল মনে মনে। ইসারায় দু'একটিকে ডাকতেই একে একে সবগুলি গা ঘেঁষে এসে দাঁড়াল। অদ্ভুত চেহারা আর অদ্ভুত ভাবভঙ্গি। কিন্তু আস্কারা দিয়ে ভাল করল না প্রমীলা। কয়েক মিনিটের মধ্যেই একেবারে অতিষ্ঠ ক'রে তুলল ওরা। কোনটা এসে টিফিন-ক্যারিয়ার ধরে টান মারে, একটা গিয়ে দামী লেদার স্যুটকেশটার ওপর ময়লা হাত বুলিয়ে এল ; তাকে ফিরাতে যাচ্ছে তো আরেকটা কোন ফাঁকে দু'পায়ের মধ্যে ঢুকে নতুন জুতোর গন্ধ শুকতে গিয়ে পায়ে লাগাল ভীষণ সুড়সুড়ি। আর সেই ডেলার মত নাভি-বার-করা ছেলেটা যতবার সাম্‌নে এসে দাঁড়াল, ততবার প্রমীলার গায়ের মধ্যে শির-শির ক'রে উঠ্‌ল। অত্যন্ত বিব্রত বোধ করল প্রমীলা। সারারাত এমনি জ্বালাতন ক'রে মারবে নাকি এগুলি ?

রাতের কেবল শুরু। গাড়ি ছেড়ে দেওয়ার বাঁশীর শব্দে মুখ তুলতেই প্রমীলা দেখতে পেলো দরজায় আরেক মূর্তির আবির্ভাব ঘটছে। ছাই-রংয়ের ট্রাউজার, তার ওপর হাফসার্ট। মাথায় সোলার টুপি, বাঁ-কাঁধে পিতলের অক্ষরে সরকারী পরিচয়-ফলক। এক হাতে মুখ-বাঁধা বড় একটা মাটির হাঁড়ি, অন্যটায় বছর দুয়েকের একটা রোগা বাচ্চা মেয়ে বিচিত্র ভঙ্গিতে ঝুলে আছে। বোঝা গেল, এই শিশুবাহিনী চালিয়ে নেওয়ার ভার পড়েছে এর উপর। কিন্তু গিরীন বোসের এর চেয়ে ঘনিষ্ঠ, এর চেয়ে গভীর কোন পরিচয় কি নেই, অন্ততঃ প্রমীলার কাছে ?

টুপি নামিয়ে গিরীন হাসল একটু—'প্রমীলা তুমি? ভারি ভাবনা হয়েছিল কিন্তু, ভাবছিলাম ওরা বুঝি কোন মেমসাহেবের গাড়িতে উঠে বসল।' তারপর একটু থেমে বলল, 'হঠাৎ এমন ক'রে আবার দেখা হবে, ভাবিনি কোনদিন।'

প্রমীলাই কি ভাবতে পেরেছিল? এই ক'বছরে গিরীনের চেহারা এমন বদলে গেছে। দুধে-আলতায় সে রং নেই গিরীন বোসের। মুখখানা ভেঙ্গেচুরে আরেক রকম হয়ে গেছে, থুতনির ওপর খোঁচা খোঁচা দাড়ি। আর ভোলানাথের মত এইসব সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে কোথায় যেতে পারে গিরীন?

'কিন্তু এগুলি নিয়ে তুমি কোথায় যাচ্ছ? জোটালেই বা কোত্থেকে?'

'জোটাতে হয়নি।' গিরীন সহজভাবে জবাব দিল, 'ওরা নিজেরাই একদিন এসে জুটেছিল দুর্ভিক্ষের সময়। এতদিন ছিল এক সরকারী রিলিফ সেণ্টারে, সেটা এবার উঠি উঠি করছে, তাই ওয়ারিশ খুঁজে খুঁজে এদের ফেরত দিয়ে বেড়াচ্ছি।'

'ভাল কোন চাকরি নিলেই তো পারতে। যুদ্ধের বাজারে কত লোকে কত সুবিধা ক'রে নিল। আর কি যে খেয়াল তোমার? বাউণ্ডুলে হয়ে রইলে চিরকাল। বিয়ে থা করোনি নিশ্চয়ই।'

গিরীন নিঃশব্দে একটু হাসল।

'কিন্তু তুমি ওদিকে কোথায় যাচ্ছ? তোমরা 'আপ'এর মানুষ, 'ডাউনে' আসার কি প্রয়োজন পড়ল হঠাৎ? মীরাটে না কোথায় যেন থাক আজকাল?'

খোঁচাটা প্রমীলা বুঝতে পারল। যাওয়া আসার নয়, ওদের সচ্ছলতার উপর কটাক্ষ করল গিরীন।

'প্রয়োজন না পড়লেই ভাল হ'ত। কিন্তু মাসীমার ছোটমেয়ের বিয়ে। মাথার দিব্যি দিয়ে চিঠি-লিখলেন; না এলে ভাবতেন, বড়-লোকীর দেমাকেই এলাম না। উনি তো ছুটি পেলেন না, তাই ছেলেমেয়েদের নিয়ে নিজেরই আসতে হ'ল।'

গিরীন বলল, 'ও, তা ভালই করেছ, মাঝে মাঝে এক-আধটু ডাউনে নামা ভাল।'

পিছন ফিরতেই প্রমীলা দেখল, ওদের কথা বলার সুযোগ নিয়ে ছেলেমেয়েগুলো কখন গিয়ে কান্তি-বুলাদের ঘিরে ধরেছে, হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখছে কেউ কেউ, এখনই হয়ত জাগিয়ে তুলবে। তেড়ে গিয়ে প্রমীলা চাপা গলায় ধমক দিল—'যা, পালা এখান থেকে।' গিরীনের দিকে চেয়ে হেসে বলল, 'সেই থেকে কেবল জ্বালাতন ক'রে মারছে।'

বাঁকা হেসে গিরীন জবাব দিল, 'তাই না কি?' ছেলেগুলি ভারি অসভ্য তো! তারপর নাম ধরে ডেকে নিজের কাছে ফিরিয়ে আনল বাচ্চাদের।

হাঁড়ির মুখ খুলে খাবার বার ক'রে সবাইকে গিরীন ভাগ ক'রে দিল, মেঝেয় ঢালা বিছানা পেতে ওদের শোয়াল। রোগা মেয়েটাকে রাখতে হ'ল একটু আলগোছে, একটু দূরে।—পাছে কোনটার হাত-পা এসে ওর গায়ে পড়ে। রাজবাড়ি ষ্টেশনে পৌঁছতে সেই ভোর পাঁচটা। ওরা অঘোরে ঘুমাতে পারবে ততক্ষণ।

বিছানা খুলতেই একটা বোট্‌কা গন্ধ নাকে এল প্রমীলার; না কি বাজারের বাসি খাবারেরই গন্ধ ওটা কে জানে! ব্লাউজের ভিতর থেকে সুগন্ধি রুমাল বার ক'রে প্রমীলা মুখের উপর বুলিয়ে নিল ছু'বার, তারপর নাকের নিচে চেপে ধরে রাখল। গিরীনের

এই মেয়েলিপনা, কদাকার পাজামা প'রে নিচু হয়ে এই ছেলে-খাওয়ানো, মেয়ে-শোয়ানো হঠাৎ ভারি বিশ্রী ঠেকল প্রমীলার চোখে।

'পাজামাটায় কিন্তু ভারি বিশ্রী দেখাচ্ছে তোমাকে।' তীক্ষ্ণ একটু হেসে না ব'লে পারল না প্রমীলা। গিরীন চোখ তুলল, বলল—

'পছন্দমত সাজগোজ ক'রে সাম্‌নে ঘুরে বেড়ালে কোন কোন মেয়েরা শুনেছি এক ধরনের আরাম পায়। কিন্তু সাজবার ভাগ্য তো সব পুরুষের সমান নয় প্রমীলা।'

'ছিঃ, ইতরামিরও একটা সীমা আছে। স্বভাবটা তোমার আজও বদলাল না।' চোখ জ্বলে উঠল প্রমীলার।

আর প্রমীলার বদলায়নি চেহারা। বাঁকা চোখে চেয়ে দেখল গিরীন। সেই নাক, সেই চোখ, ছোট কপালের দুপাশে কোঁকড়ান চুলের গোছা। হঠাৎ রাগলে আগের মতই নিচের ঠোঁটের কাঁপন যেন আর থামতে চায় না। অবিকল আগের মানুষ, মনে হয় না মাঝখানে সাতটা বছর কেটে গেছে। বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না, তিনবার মা হয়েছে প্রমীলা। ওর সরু লম্বা আঙ্গুলগুলি দুহাতে চেপে ধরলে আজও বোধ হয় সেদিনের উত্তাপ ফিরে আসে। ফিরে পাওয়া যায় সেদিনের প্রমীলাকে। কিন্তু না, প্রমীলা সরে গেছে আরও অনেক দূরে। আজ ওরা দু'জনে পৃথিবীর দুই প্রান্তের মানুষ! সেদিনের পরিচয় না থাকলেই বুঝি ভাল হ'ত। যাত্রাটা সহজ হ'ত দুজনের কাছে, এমন ক'রে মুখ ফিরিয়ে থাকার কারো প্রয়োজন হ'ত না। গিরীনের কষ্ট হ'ল ওর জন্যে। করুণায় মন ভরে উঠল। ভারি করুণার পাত্র ওরা। চোখে ওদের কি অঞ্জনই লেগেছে। সাজপোষাক ছাড়িয়ে ওদের দৃষ্টি

চলল না আরেকটু। সাজপোষাকের ভিতর দিয়ে আসল মানুষটাকে চিনে উঠতে পারল না কোনদিন।

ছোট একটা ষ্টেশন পার হয়ে গেল। এখানে মেল ট্রেণ থামে না। শুধু বাঁশী বাজিয়ে যায় একবার, জানালা দিয়ে চেয়ে থাকলে স্পষ্ট কিছু চোখে পড়ে না। কেবল গাছপালার জড়াজড়ি, আবছা একটানা তরল অন্ধকার; প্রমীলা এক সময় উঠে গিয়ে ছেলে-মেয়েদের জাগিয়ে বসাল। খাবার সাজিয়ে ধরল সাম্‌নে, ফ্লাস্ক থেকে দুধ ঢেলে দিয়ে ফিডিং কাপে ভরে কোলের মেয়েকে দুধ খাওয়ালো। তারপর মেয়ে কোলে ক'রে হাতের পাতায় মাথা রেখে শুয়ে পড়ল। ট্রেণের দোলায় দোলায় ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়বে এবার!

ঘুম পায় না গিরীনের। চলন্ত গাড়িতে কোনদিন ঘুম আসে না চোখে। ভাল লাগে জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে থাকতে। বাইরের অসংবদ্ধ খণ্ড দৃশ্যের মত মনের মধ্যে টুক্‌রো টুক্‌রো কত ভাবনার বুদবুদ ওঠে আর মিলিয়ে যায়। একটার পর একটা, অর্থহীন। আজ কিন্তু ঘুরেফিরে সাত বছর আগেকার একটি ছবির গায়ে এসে মন আটকে রইল। প্রমীলা সেদিনও এমনি ঐশ্বর্যময়ী! সাজে, সজ্জায়, রূপে; কলেজের ছুটির পরে ছেলেরা ওদের বাড়িতে যাওয়ার জন্য নানা অছিলা খুঁজে বেড়াত। গিরীনকে কিন্তু প্রমীলার বাবা সীতাকান্ত নিজে থেকেই একদিন ডেকে পাঠালেন। বললেন, 'বাজে খরচ করার মত সময় তোমার হাতে নেই জানি গিরীন, তবু ওরই মধ্যে ফাঁকে-চক্রে এসে প্রমীলাকে একটু দেখিয়ে শুনিয়ে দিও। এক পাড়ায় থাকি ব'লে এটুকু দাবী তো করতে পারিই।'

গিরীন আপত্তি করেনি। দেখিয়ে শুনিয়ে দিত আর চেয়ে চেয়ে দেখত এই ঠোঁট, এই চোখ, ছোট কপালের তুপাশে কোঁকড়ান চুলের গোছা। একটু একটু ক'রে ভুলে যেতে লাগল। ওদের অবস্থার মিল নেই, মিল নেই চাল-চলনে, আদব-কায়দায়; অবশেষে একদিন সব ভুলে যাওয়ার দিন এল। হ্যাঁ, সেদিন সবই ভুলে গিয়েছিল গিরীন, না হলে বেকুবের মত সোজাসুজি একথা প্রমীলাকে বলল কি ক'রে? আজ সেই ছেলেমানুষির কথা মনে পড়ে ওর হাসি পাচ্ছে। প্রমীলার সেটা অঙ্ক বুঝে নেওয়ার দিন, পড়ার টেবিলে মুখোমুখি বসেছে তু'জন, প্রমীলার হাতে পেন্সিল, সামনে খাতা খোলা [illegible] কিন্তু চোখ অন্যত্র।

গিরীন আস্তে আস্তে ওর পেন্সিলশুদ্ধ হাতটা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে এল, বলল, 'চোরের মত এই লুকোচুরি আমার ভাল লাগে না প্রমীলা, তার চেয়ে তোমার বাবাকে বলি।'

প্রমীলা চোখ তুলল, 'কি, বিয়ের কথা? কিন্তু বাবার যদি মত না থাকে?'

গিরীন বলল, 'তা হলেও আমি ভাবি না। যার মতটা আসল, তার মত বুঝি আমি পাইনি?'

'তা পেয়েছ,' ভুরুর একটা আশ্চর্য ভঙ্গি ক'রে প্রমীলা বলেছিল।

কিন্তু সে ভঙ্গি যে কিছু নয়, সে ভরসার যে কোন দাম নেই, তুদিন বাদেই সেটা টের পেয়েছিল গিরীন। আর বুঝেছিল বড় হিসাবী মন মেয়েদের।

রোগা মেয়েটা সরতে সরতে একেবারে পায়ের কাছে এসে পড়েছে; গিরীন ওকে ঠিক ক'রে শোয়াল। পাশে সারবেঁধে

ছেলেমেয়েরা বিভোরে ঘুমোচ্ছে। এ ক'মাস ওরই আদেশে নির্দেশে ওরা চলেছে ফিরেছে। তবু এত কাছে এসে গিরীন ওদের চেয়ে দেখেনি কোনদিন। অনেকদিন চুল ছাঁটানো হয়নি, সেই কবে ন্যাড়া ক'রে দেওয়া হয়েছিল; ফিরিয়ে দেওয়ার আগে আরেকবার ভাল ক'রে চুল ছাঁটিয়ে নিয়ে গেলেই চলত। ঝিটাকে কতদিন বলেছে, সাতদিন বাদে বাদে প্যান্ট্ ফ্রক্ কেচে দিতে। ময়লা জমে জমে সেগুলির রংই আর চেনা যায় না। রাজবাড়ি ষ্টেশনে ক'টায় পৌঁছবে গাড়ি? ঠিকানা দেখে দেখে খবর দিতে হবে। ওদের কারো বাবা আসবে, কারো বা মা। কে জানে কার বাপ-মার অবস্থা কি রকম, কি তারা খায়, কি তারা খাওয়াবে এদের। ওদের অনেকের সাথেই হয়ত আর কোনদিন দেখা হবে না গিরীনের। এক অদ্ভুত বাৎসল্যে গিরীনের মন ভারি হ'য়ে রইল।

রোগা মেয়েটা কিছুক্ষণ থেকেই খুঁত খুঁত করছিল, আজও বোধ হয় জ্বর একটু হয়েছে। গিরীন সস্নেহে হাত বুলাল ওর বুকে পেটে। কিন্তু মেয়েটা শান্ত হ'ল না। বরং একটু একটু ক'রে সুর চড়িয়ে বিছানার উপর এক সময় সোজা উঠে বসল। সুর আরেকটু চড়লেই প্রমীলাও হয়ত জেগে উঠবে। চঞ্চল হ'য়ে উঠল গিরীন। কোলে তুলে নিয়ে আস্তে আস্তে দোলালো খানিকক্ষণ— খানিক-পায়চারী ক'রে দেখল, জানালার ধারে নিয়ে গিয়ে বাইরে তাকানোর চেষ্টা করল। কিন্তু মেয়েটার কি যে হ'ল আজ! কান্না থামান দূরের কথা, চোখ খুলে দয়া ক'রে একবার চাইল না পর্যন্ত। সেই একটানা সুর। রাতের ট্রেণে ওকে না আনলেই বোধ হয় ভাল হ'ত। বিরক্তিতে নয়, প্রমীলার জেগে ওঠার আশঙ্কায়ই যেন সঙ্কুচিত হ'য়ে রইল গিরীন।

'কী আপদ! একটু ঘুমোতেও দেবে না দেখছি।' প্রমীলা ধীরে ধীরে মাথা তুলল। ওর কুঞ্চিত ভ্রূর সামনে গিরীনের যেন পরাজয় হ'ল চিরদিনের মত।

'ওটাকে যখন গাড়িতে তুলেছ, তখনই জানি সারারাত জ্বালিয়ে মারবে।'

'না, সারারাত জ্বালাবে না।' চটে গিয়ে গিরীন বলল, 'পরের স্টেশনেই আমরা নেমে যাচ্ছি অন্য গাড়িতে।'

'কিন্তু তারও তো দেরি আছে।'

গিরীন জবাব দিল না। বাচ্চাটাকে আরেকবার বুকের মধ্যে চেপে ধরতে চাইল। কিন্তু তার এই অন্তরঙ্গতায় মেয়েটা আরও যেন ক্ষেপে উঠল। হাত-পা ছুঁড়ে প্রতিবাদ জানাল, ও আদরে সে ভুলবে না। ধৈর্যেরও সীমা আছে। সজোরে একটা ঝাঁকানি দিয়ে দাঁতে দাঁত চাপল গিরীন।

'চুপ।'

'চমৎকার! এই চলুক আর কি সারারাত।' প্রমীলা শ্লেষের সুরে বলল।

নিজেকে ভারি অসহায় মনে হ'ল গিরীনের। সারারাতের মধ্যেও কি ওর কান্না আজ থামবে না!

বিরক্তিতে প্রমীলা কিছুক্ষণ গুম হয়ে রইল। তারপর চেঁচিয়ে উঠল।

'খাইয়েছ ওকে? না কি কেবল দুলিয়ে দুলিয়েই শান্ত করতে চাও?'

'গাড়িতে ওঠার আগেই তো খাওয়ালাম একবার।' গিরীন অন্য দিকে তাকিয়ে জবাব দিল।

'তবে আর কি, সারা রাতের জন্যে ওকে রাজা ক'রে দিয়েছেন।'

রাগ ক'রে প্রমীলা ফিরে এল টিফিন-ক্যারিয়ারের কাছে। দুধ প্রায় সবটা বুলারই লেগেছে; ফ্লাস্কের তল্লায় সামান্য একটু পড়ে ছিল। ফিডিং কাপে ঢেলে সেইটুকুই গিরীনের সাম্‌নে এনে ধরল; কিন্তু আনাড়ি হাতে খাওয়াতে গিয়ে গিরীন সবটুকুই বাইরে ঢেলে ফেলল, এতটুকু মেয়েটার মুখে গেল না, ওর গলার কাছে জামাটা শুধু ভিজে উঠল, বেকুব বনে গিয়ে চুপ ক'রে রইল গিরীন। আর সেই সুযোগে মেয়েটা আরেক দফা চেঁচিয়ে উঠল।

প্রমীলার আর সহ্য হ'ল না। রাগ ক'রে ওকে ছিনিয়ে আনল গিরীনের কোল থেকে, কোলের উপর শুইয়ে দিয়ে দেখল, কেঁদে কেঁদে মেয়েটা নীল হয়ে উঠেছে। কাঁদবার শক্তিও যেন ফুরিয়ে এসেছে। ভারি রোগা আর পাতলা হাত-পা। কান্তি, দিলু, বুলা ওরা কেউ এ বয়সে এ রকম ছিল না, একটু চেঁচালেই কানের পাশে এমন নীল শিরা জেগে উঠত না কারো। কোলের মধ্যে শুয়ে ওর ভীরু কাতর দুখানা হাত প্রমীলার বুকের কাছে কি যেন খুঁজে বেড়াল। এক মুহূর্ত কি যেন ভাবল প্রমীলা, তারপর পিছন ফিরে ব্লাউজের বোতাম খুলে ওর মুখে স্তন গুঁজে দিল, প্রমীলার চোখে চোখ রেখে অবাধ্য মেয়েটা হাসল এতক্ষণে, গিরীন কখন এসে কাঁধের কাছে দাঁড়িয়েছে, প্রমীলা লক্ষ্য করেনি, ঘাড় ফিরিয়ে চোখাচোখি হতেই প্রমীলা হেসে বলল—

'দেখেছ কি, ভয়ানক দুষ্টু, কেবলই কামড়ে দিচ্ছে।'

গিরীন নিঃশব্দে হাসল।

গ্রীবা বাঁকিয়ে এক অপরূপ ভঙ্গি ক'রে প্রমীলা বলল—

'হাসছ, লজ্জা করে না তোমার? আমি বুঝি ব্যথা পাইনে?' অহেতুক লজ্জায় প্রমীলা নিজেই আরক্ত হয়ে উঠল।

আরেকটু ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়িয়ে গিরীন বলল—

'রাগ করবে না বল, তাহলে একটা কথা বলি।'

'কি?'

'আমার মেয়ে কিন্তু এর চেয়ে সুন্দর হ'ত না।'

'কি অসভ্য! তুমি বুঝি ঐ কথাই ভাবছিলে এতক্ষণ।'

লজ্জায় প্রমীলা চোখ তুলতে পারল না। মুখ নিচু করে রইল।

ট্রেণের একটানা ঘচ্ ঘচ্ শব্দ। ভয়ে ভয়ে বাঁশী বাজল আরেকবার। ছোট ষ্টেশন। মেল ট্রেণ এখানেও থামবে না।

রাজ যোটক

স্টেশনের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে রুমালে মুখ মুছল বনলতা। চোখের কাজল আর মুখের পাউডার বাঁচিয়ে যতটা জোরে সম্ভব ঠিক ততটা জোরে, তার বেশি নয়। তবু রুমালে ঘষা-লাগা কাজল উল্টে এসে ফের গালে কপালে ছায়া ফেলল, মনে হ'ল ও যেন কাজলের দাগ নয়, একশো দুশো কিংবা তারও বেশি মাইল একটানা ট্রেন জার্নির ক্লান্তিতে চোখে-মুখে কালি মেরে দিয়েছে। অনেকক্ষণের দোলানি-ঝাঁকানির পর মাটিতে পা ফেলতে পেরে বনলতা যেন শ্বাস ফেলে বাঁচলো, ভাবটা এমনি। কি একটা ডাউন ট্রেন এইমাত্র এসে ইন্ করেছে, স্টেশনের মধ্যে একগাদা মানুষের ভিড়, একটু পরেই অবশ্য ট্রাম, বাস, ট্যাক্সি, রিকসায় ছুট-ছাট লোকগুলো গিয়ে ঢুকলো, আর সে ভিড় পাত্‌লা হয়ে এলো। বনলতা কিন্তু তখনও অচল, ওর সাথে মালপত্র কিছু নেই। আরও খানিক বাদে একটু যেন চঞ্চল হয়ে উঠলো বনলতা। এদিক-ওদিক শঙ্কিত চোখ ফেলল, কারো কি এ্যাটেণ্ড করার কথা ছিল স্টেশনে? উৎকণ্ঠায় হাতের ব্যাগটা একবার মাটিতে রাখলো আবার তুলল, ডান হাত বাঁ হাত করল, সত্যি হয়ত কেউ এলো না, চারিদিকে চোখ ফেলতে অনেক জোড়া চোখের সঙ্গেই চোখাচোখি হ'ল বনলতার। কোন জোড়া বাঁকা হয়েই আছে, কোন জোড়া এমন ভাব করছে যেন 'ওর আবার দেখার কি আছে?' একজন কিন্তু ঠিক সোজাসোজি চেয়ে। তার চোখ ফিরিয়ে নেবার তাড়া কম, ধুতি-পাঞ্জাবির সভ্য-ভব্য ভদ্রলোক।

কড়া ইস্তিরির লংক্লথের পাঞ্জাবির উপর ছয়কোণী সোনার বোতাম শুধু একটু বে-মানান না একেবারেই বেঢপ চট্‌ ক'রে বলা শক্ত। সঙ্কুচিত পা ফেলে বনলতা এগিয়ে এলো তার দিকে। ডাকল, 'শুনুন!'

'আমাকে বলচেন,' সামান্য একটু হাসল প্রভুপদ।

'হ্যাঁ, আপনাকে। বলতে লজ্জাও করে। আবার না ব'লেই বা কি করি বলুন। কথা ছিল কেউ না কেউ স্টেশনে থাকবে। কিন্তু কেউতো এলো না। আশ্চর্য—বীরেটাকেও কি কেউ পাঠাতে পারল না। নাকি চিঠিই পায়নি তারই বা ঠিক কি?'

'কোথেকে আসছেন আপনি?'

'এলাহাবাদ থেকে?'

'এখানে বাসা কোথায় আপনাদের?'

'আমাদের নয়, মামার বাসা।' কলিনস্‌ স্ট্রীট না কি একটা আছে সেখানে। চট্‌ ক'রে ব্লাউজের ভিতর থেকে শান্তিপুরী মনিব্যাগ টেনে বার করল বনলতা। চিলতে কাগজে ঠিকানা লেখা আছে। ৫৭।১, কলিনস্‌ স্ট্রীট, সেই সাথে ডিরেকশন। কেয়ার অব যোগেশ্বর দত্ত। দোতলা লাল বাড়ি।

'তা একটা রিকসা নিলেই তো পারেন', সিগারেটের ছাই ঝেড়ে প্রভুপদ বলল।

বনলতা বলল, 'তা তো নিতেই হবে, কিন্তু পাড়াটা শুনেছি খারাপ। ফিরিঙ্গিদের আড্ডা।' মনিব্যাগের মুখে তের আনা রেজগীর ওপর হাত রাখল বনলতা, বলল, 'কেমন যেন ভয় ভয় করে।'

'ও' আবার একটু হাসল প্রভুপদ। কয়েক আনা পয়সায় রিক্সা চেপে হাওড়া থেকে একেবারে কলিনস্‌ স্ট্রীট! টুক্‌ ক'রে সিগারেটটা

ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তুড়ি মেরে হাত তুলে একটা রিকসা ডাকল প্রভুপদ, 'এই রিকসা ইধার আও।'

ঘাড় গুঁজে মন্থর গতিতে হাওড়া ব্রিজের উজান টেনে দুই শোয়ারী নিয়ে এলো রিকসাওয়ালা। গঙ্গার মৃদু হাওয়ার আবেশে আরোহীরা চুপচাপ, কিন্তু ব্রিজ পার হওয়ার ঠিক মুখটাতে বনলতা উঠে বসল খাড়া হয়ে। প্রভুপদর ঘাড়ের পাশে ডান হাত এলায়িত ক'রে দিয়ে শান্ত গলায় বনলতা বলল—

'বোতাম খুলুন, আর ঐ আংটিটা ঝটপট খুলে আমার হাতে দিন। পেনটা না দেন না দিলেন, সর্বস্ব নিতে চাই না। প্রাণটাওতো দিয়েছিলেন, তাই না? সেটাও ফিরিয়ে দিচ্ছি! নিন তাড়াতাড়ি করুন। নেমে আমাকে দশের-এ বাস ধরতে হবে।'

অবাক বিস্ময়ে বনলতার আপাদমস্তক চেয়ে দেখল প্রভুপদ, বলল—'মানে!'

বনলতা বলল, 'হয়েছে, আর নেকামো করতে হবে না। মানে আপনি বুঝেছেন। ক্যাবলা সেজে ফাঁসাবার চেষ্টা করেন তো এক্ষুণি চেঁচাব।'

'কি চেঁচাবেন আপনি?' প্রভুপদ নিজেই চেঁচিয়ে উঠলো।

ভ্রূ বাঁকিয়ে বনলতা বলল, 'মেয়েদের কি ব'লে চেঁচান সুবিধে জানেন না? বলব, 'বাসায় পৌঁছে দেবার অছিলায় রিকসায় বসিয়ে কোমরে হাতের চাপ দিয়েছেন। আর সত্যিই তো এতক্ষণ একজন ভদ্রমহিলার পাশে বসে দিব্যি হাওড়া ব্রিজের হাওয়া খেয়ে এলেন তার মাশুল দেবেন না, সে কি মাগ্‌না?'

ওর সর্বাঙ্গে চোখ বুলিয়ে নিল প্রভুপদ। বয়স বাইশ-তেইশের বেশি নয়। পাত্‌লা কাঠামোর ওপর বেশ চোখা-চাখা গড়ন।

পরনে বাজে জমিনের চমৎকার ছাপা শাড়ি। গলায় নকল সোনার, হ্যাঁ নকল সোনারই সরু চেন হার, তার মাথায় চার আনির 'স্বস্তিকা' পেণ্ডাণ্ট। ঈষৎ ঠেলে ওঠা কণ্ঠার হাড় আর শক্ত চোয়ালে কেমন যেন একটা রূঢ় ঔদ্ধত্য। আবার কপালে ছোট সিঁদুরের ফোঁটা, সিঁথিতে সিঁদুর—যেন অর্ধাবগুণ্ঠিতা কুলবধূটি। মুখ নামালে অন্য মানুষ। সে মুখের বাণী এই!

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে চেয়ে রইল প্রভুপদ।

'কি দেখছেন হাঁ ক'রে? রূপ? যেটুকু দেখেছেন রাত্রে শুয়ে বউর কাছে ওটুকুর গল্প করতেই রাত ভোর হয়ে যাবে। বোতাম খুলুন শীগ্গীর', বনলতা ধমকে উঠল।

'মাইরি আর কি!' চকিতে বদলে গেল প্রভুপদ। 'দুটো রসের কথা কয়ে, দুটো ধমক দিয়ে বার আনির সোনার বোতাম ছিনিয়ে নিতে চাও, লাইনটা কি এতই সোজা?'

আড় চোখে চেয়ে দেখল বনলতা। প্রভুপদর একটা চোখ আধ-বোজা, মুখে অবজ্ঞার হাসি। কোথায় যেন একটু ভুল হয়ে গেছে, লংক্লথের পাঞ্জাবি এই মুহূর্তে মনে হ'ল বেঢপও নয়, বরং মানানসই, কিন্তু চেঁচালে কি করতে পারে প্রভুপদ। বড়বাজারের মানুষ-গুলোকে লেলিয়ে দিলে ও পৌরুষ কতক্ষণ।

'রিকসা—' বনলতা চেঁচাতে যাচ্ছিল।

প্রভুপদ চাপা গলায় আদেশ দিল রিকসাওয়ালাকে, 'চল জোরসে জলদি'।

ঘাড় বাঁকিয়ে বনলতা বলল,

'কিন্তু চেঁচালে কি করবেন আপনি?'

প্রভুপদ আবার হাসল। বলল—

'তাই বল, কি করতে পারি তুমি নিজেই পরখ কর। তার জন্যে লোক ডাকাডাকির দরকার কি? ভেবেছ তুমি চেঁচালেই কি আমিও চেঁচিয়ে উঠব, মোটেই না বরং কেঁদে আকুল হব। চোখে মুখে একটা সব-খোয়ানোর ভাব ফুটিয়ে তুলব। আর নিমেষে তুমি আমার বউ বনে যাবে। দু'চার মাসের নয় ঝাড়া দশ বছরের। শুধু তাই নয়, তোমার কোলে নন্তু-সন্তু আছে, তাদের কাঁদিয়ে রেখে তোমাকে ডাক্তার দেখাতে নিয়ে যাচ্ছি, তোমার মাথার ঠিক নেই।' বলতে বলতে সত্যি প্রভুপদ বনলতার হাত দুটো জড়িয়ে ধরল।

'পাগলামী করো না কল্যাণী লক্ষ্মীটি, এটা রাস্তা। হ্যারিসন রোড। আমরা এখন বাড়িতে নেই। আর একটু চুপ ক'রে থাক লক্ষ্মীটি, সোনা আমার।'

'বদমাস্, ন্যাকা কোথাকার, কে আপনি?'

'হা ভগবান, আমাকেও আপনি! আমি! আমি। একবার চোখ তুলে চাও কল্যাণী, সন্তু-নন্তুর কথা মনে কর। ওদের আমরা বাসায় কাঁদিয়ে রেখে এসেছি।'

হাত ছেড়ে দিয়ে প্রভুপদ বলতে লাগল, 'তুমি তারপরেও যদি চুপ না কর, তাহলে আদরে আঁকড়ে ধরার ছলে কি ক'রে তোমার ঠোঁট আমার কাঁধে ঠেকিয়ে নির্বাক করাতে হয় তাও আমার জানা আছে। আর তারও পরে আছে বড়বাজার থানা। সেটা তো দূরে নয়, এত সব জান আর এটুকু জান না।'

চোখ জ্বলে উঠল বনলতার।

'আমার নাম কল্যাণী নয়, আমাকে নামতে দিন।'

'পাগল! এতটা পথ একসঙ্গে কেবল হাওয়া খেয়েই এলাম। একটু চাও খাবে না। ভয় নেই তোমার ঐ ক' আনা পয়সায় ভাগ

বসাব না। শেয়ারে কাজ করতে যদি রাজি থাকতো এখন থেকে সব খরচ আমার অথচ লাভের বখরা আট আনা। সত্যই তোমার মত মেয়ের সাথে যে এমন ক'রে আলাপ হবে ভাবিনি। চাই কিন্তু ঠিক এমনি একজন। ট্রামে বাসে ফুটপাথে মেয়ে দেখি আর ভাবি ওদের একটিকে সাথে পেলে কাজের সুবিধে কত।' হঠাৎ যেন খুব খুশি হয়ে উঠল প্রভুপদ।

বনলতা আর কোন কথা বলল না। ওর বুঝতে বাকি রইল না কিসের শেয়ারের কথা বলছে প্রভুপদ। ধীরে সুস্থে ওরা রিকসা থেকে নামল, ভাড়া চুকিয়ে দিল, তারপর খানিকটা হেঁটে গিয়ে কলেজ ষ্ট্রীটের নতুন-খোলা এক রেষ্টুরেন্টের জেনানা কেবিনের পর্দা সরিয়ে ঢুকে পড়ল। আশ্চর্য, ওদের চলন-বলন ধরন-ধারন দেখে এখন আর একথা কে ভাববে যে, একটু আগে তু'জনের মধ্যে অগ্নি-দৃষ্টি বিনিময় হয়ে গেছে, একজনের চোয়াল লক্ষ্য ক'রে আরেকজনের চোয়াল শক্ত হয়ে উঠেছে। বরং মনে হবে ঠিক উল্টো। যেন তু'জনের কতকালের জানাশোনা। তুটো ধোঁয়াটে চায়ের কাপ সাক্ষী রেখে ওরা অনেক মতলব ফাঁদল, অনেক ফন্দী আঁটল।

মোলায়েম গলায় প্রভুপদ বলল—

'আশ্চর্য! টোপ ফেলার আগে আমাকে দেখে তোমার একটুও সন্দেহ হ'ল না? দেখতে শেখা এখনও তোমার বাকি, কিন্তু দেখাতে তুমি সত্যি শিখেছ বনলতা, আমার চোখেও ধোঁকা দিয়েছিলে, ভাবলাম সত্যি বুঝি তুমি দিল্লী মেলে এসেই নামলে। কাজ হবে তোমাকে দিয়ে।'

'কিন্তু আজ আর হচ্ছে কই?' বনলতা বলল।

'আজ অবশ্য আমারও কিছু হয়নি। সেই দুপুরে একটা মনিব্যাগ তুলেছি। মিলল মাত্র দু'টাকা দু'আনা, মানে কালকের রেশনের দামটাও উশুল হ'ল না। পরশু ভাইয়ের ইস্কুলের মাইনে দেওয়ার তারিখ।'

'আপনার দেখি পুরো সংসার', বনলতা হাসল।

'আর তোমার?'

'আমার? আধখানা বলতে পারেন, বাবা অথর্ব, হাঁপানির রোগী, খোরাক দিনে দু' ছটাকের বেশি না। আর আছে মা।'

'কেন, সিঁথিতে সিঁদুর দেখছি, বিয়ে করনি?'

বনলতা হেসে উঠল, একটু জোরেই বলল—

'ওটা সুবিধেমত দিনে দু'একবার পরি আবার মুছে ফেলি। কিন্তু এ রকম বসে গল্প করলে তো পেট ভরবে না।'

'ব্যস্ত হয়ো না' প্রভুপদ শান্ত গলায় বলল, 'একঘণ্টা পর পর দুটো ট্রেণ আছে। এবার তো আর একা নয় দু'জন—

ভাব তুন এক্সপ্রেস এসে লাগল। দুজনে ছুটে গেলাম, যেন আমাদের কেউ আসবে এই ট্রেণে যেন তোমার কারো আসার কথা ছিল স্টেশনে। ঢোক এক সেকেণ্ড ক্লাস কম্পার্টমেণ্টে, আমি নিচে, তুমি ভিতরে। দেখবে বাঁধাছাদা বিছানাপত্র চখাচখী দুটি স্বামী-স্ত্রী, কলকাতা পৌঁছাবার খুসিতে ডগমগ। অথবা মাঝ-বয়সী মোটা চাকুরে, স্বামীর শক্তপোক্ত পান মুখে দেওয়া স্ত্রী হলেও ক্ষতি নেই। ছেলেমেয়ের জাঙ্গাল পেরিয়ে কেবল পাশে একটা সুটকেশ থাকলেই হ'ল। স্ট্রাপে বাঁধা, মালদার। ওদের সাথে দু'টো কথা বল, একটু হাস, দুবার ঘুরে দাঁড়াও, পায়ে পায়ে সুটকেশ দরজার কাছে চলে আসবে, তারপরের ভাবনা তোমার নয়।'

প্রভুপদ মিটিমিটি হাসতে থাকে।

মনে মনে ওর তারিফ না ক'রে পারে না বনলতা। পাকা লোক। দৃশ্যটা কল্পনা ক'রে হাত-পা যেন নিস্‌পিস্‌ করতে থাকে বনলতার।

একটু পরে তুজনে উঠে রাস্তায় নেমে এল. এবার আর রিকসা নয় হেঁটে চলল তুজনে। আবার সেই হ্যারিসন রোড, বড়বাজার, হাওড়া ব্রিজ, স্টেশন। প্রভুপদর টাইমিং মিলিয়ে পর পর তুটো গাড়ি এল, একটা স্টেশন ছাড়ল। সব কটাতেই ওরা চান্স নিল, ছুটাছুটি করল, যাওয়ার যাত্রী সাজল, নামার ভান করল; কিন্তু কি একটা যোগাযোগ যেন ঘটেছে, আজ একটা মালের গায়ে হাত পর্যন্ত ছোঁয়ানোর সুযোগ মিলল না। আশ্চর্য।

তবু প্রতীক্ষা ক'রে থাকতে হবে, আরও গাড়ি আসবে, হোক একটু রাত ক'রেই। কিন্তু তার আগেই পুরী প্যাসেঞ্জারের কোন এক যাত্রী দেড়ঘণ্টা আগে এসে উপস্থিত, এনকোয়ারী অফিসারের সাথে তার বচসা চলল কিছুক্ষণ। অবশেষে হার মেনে মুখ নিচু করল। টাইমের হিসাবে তারই ভুল হয়েছে।

কে এল এই—ভোলাবাবু? পলকে দেখে নিল ওরা, বাবুই বটে, পয়সাওয়ালা বাপের ছেলে পুরী যাচ্ছে হয়ত হাওয়া বদলাতে। সখের যাত্রা। পাশে কুলির মাথায় হোল্ডঅল আর সুটকেশ একটা। যুবকটি সোজা চলে এলো ফার্ষ্ট ক্লাস ওয়েটিং রুমে। বনলতা আর প্রভুপদ ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়াল। একটুকাল চাপা গলায় কি যেন বলাবলি করল, তারপর এসে ওয়েটিং রুমে ঢুকল। মানে, ঢুকল কেবল প্রভুপদ, আর ওর পাঁজাকোলে ক'রে ঢুকাতে হ'ল বনলতাকে

আসন্ন ফিটের বিক্ষেপে শ্বাস যার ঘন হয়ে উঠেছে। কোন রকমে একটা চেয়ারে ওকে শুইয়ে দিয়ে অনন্ত মমতায় প্রভুপদ ওর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে ডাকল—'কল্যাণী'।

না, কল্যাণী কথা বলে না, কি যেন বলতে চায় অথচ পারে না। তাই বোধ হয় ওর ঠোঁট কেঁপে কেঁপে উঠছে। বিমূঢ় অসহায় প্রভুপদ ফিরে দাঁড়াল। হ্যাঁ, ওষুধে ধরেছে, লক্ষণ ভাল, সাম্নে সেই ভোলাবাবু—বিস্মিত হতবাক্ 'আমি কি করতে পারি' ভাব। অবলীলায় তার হাত জড়িয়ে ধরে প্রভুপদ বলল, 'আপনাকে জানি না, চিনি না কিন্তু সে ভাবনা এখন আমার ভাববার সময় নেই, আপনি আমার ভাই, ওকে একটু দেখুন আপনি, ডাক্তার নিয়ে আসি, দেরী হলে ওকে আমি আর বাঁচাতে পারব না। ত্থু'পা এগিয়ে আবার ফিরে এল প্রভুপদ। ডাকল—

'কল্যাণী' যেন এক্ষুনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়বে। তৃতীয় মানুষটি এক মুহূর্ত কি যেন ভাবল, তারপর দৃঢ় গলায় বলল, 'আপনাকে যেতে হবে না আমিই যাচ্ছি বরং।'

'যাবেন আপনি?' পরম ভরসায় প্রভুপদ ওর মুখের দিকে তাকাল, আর কিছু না একটা মিলক্ ইন্‌জেক্‌শান আনতে বলবেন টেন সি. সি.।'

আবার ওরা সেই দুজন। দরজার দিকে চোখ রেখে প্রভুপদ আরও কিছুক্ষণ বনলতার কপালে মাথায় হাত বুলাল, তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে চেয়ারের হাতলে হেলে বসল। বলল—

'কেমন খেললাম'—

'চমৎকার।' চোখ বুজেই জবাব দিল বনলতা।

'আর কেন ওঠ এবার', প্রভুপদ বলল।

কিন্তু বনলতা উঠল না, চোখ খুলে চাইল শুধু—সারাদিনের ছুটাছুটির পর শুতে পেয়ে ওর কি আর উঠতেই ইচ্ছে করছে না? প্রভুপদ দেখল চোখ চেয়ে থাকলেও ওর চোখের পাতার নিচে ঘামের দাগ। কণ্ঠার জাগা-জাগা হাড় দুটি ভেসে থাকা চিলের ডানার মত ছড়িয়ে আছে। প্রভুপদর হাত আবার নেমে এল ওর নরম চুলের ওপর, এসে থেমে রইল মমতায়। এখন উঠে গেলেই হ'ল। হোল্ড-অলটা বগলে ক'রে সুটকেশ হাতে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসা শুধু, তারপর নিশ্চিন্ত।

আর নইলে? নইলে একটু পরেই হয়ত ডাক্তার এসে পড়বে, সেই সাথে সব প্ল্যান ভেস্তে দিয়ে এসে হাজির হবে হোল্ড-অল আর সুটকেশের মালিকও।

আসে আসুক, তবু ওরা এই মুহূর্তে উঠে দাঁড়াতে পারে না।

হাত বাড়িয়ে প্রভুপদর হাতটা ছুঁয়ে রইল বনলতা।

শিকার

এ বাড়ির নম্বরটা রসা রোডের, কিন্তু ভিতরের চেহারা বেলে-ঘাটার। পাশাপাশি দুখানা বেডরুম, ক্ষুদে একটা রান্নাঘর, মাঝখানে এক ফালি উঠোন। আসলে আলাদা কোন বাড়িই নয় এটা। পিছনের সাদা বড় দোতলা বাড়িটারই বাড়তি একটা অংশ। ফলে এ বাড়িতে ভোর হতে দেরী হয় আর সন্ধ্যা হয় আগে আগে। বড় বাড়িটা অনেকখানি আলো যেমন আড়াল ক'রে রেখেছে তেমনি আবার যেন অভয়ও দিচ্ছে, ভয় কি? যা খুশি ক'রে যাও, যেমন খুশি চাল মারো, বাইরের কেউ টের পাবে না। তবু প্রভাকরের চাকরী যাবার মুখে সুজাতা বলেছিল, চারটি তো মোটে প্রাণী! কাজ কি দু'খানা ঘরের চল্লিশ টাকা ভাড়া টেনে, তার চেয়ে চলো আর কোথাও উঠে যাই। কুড়িটি টাকাতো বাঁচবে। প্রভাকর জবাব দিয়েছিল, থাম তুমি, এ বাড়ির শুধু নম্বরটার জন্যে আমি কুড়ি টাকা দিতে রাজি আছি।

আজ বিকেলে আসবার কথা শিবতোষের। নগর জীবনের শুরুতে শিবতোষ ছাত্র ছিল প্রভাকরের। মোটা টাকার ট্যুইশনের ছাত্র। প্রভাকরের একদা চাকরীর বিকল্প। সকালের ডাকে দু' পয়সার লোকাল পোস্ট কার্ড শিবতোষের আসার খবর নিয়ে এসেছে আর সেই থেকে সারা বাড়িটা ওর প্রত্যাশায় উন্মুখ হয়ে আছে। পোস্ট কার্ডের দু'টি লাইন যেন গানের দু'টি কলি হ'য়ে গুন্ গুন্ করছে বাড়িময়। বাড়ি বলতে চারটি প্রাণী। স্বামী-স্ত্রী আর দু'টি শিশু।

বাড়ি বলতে দু'খানা ছোট ঘর, সঙ্গে এক ফালি উঠোন। দুপুরের চড়া রোদ মরে গিয়ে একটু একটু ক'রে বিকেল হ'ল। তক্তাপোশের ওপর জোড়াসন হয়ে বসে কয়েকটা জরুরী চিঠির ঠিকানা লিখছিল প্রভাকর। ঘাড় ফিরিয়ে দেয়ালে লট্‌কানো হাত ঘড়িটার দিকে একবার ভ্রূ কুঁচকে তাকাল, তারপর হাত বাড়িয়ে তাকের ওপর থেকে একটা মোটা বাঁধানো একসারসাইজ বুক টেনে নিল। প্রভাকর চিরদিনই একটু অতিমাত্রায় মেথডিক্যাল। মানুষটাই একটু গোছান স্বভাবের। আজ শিবতোষ আসছে, এর আগে যারা এসেছে তাদের প্রত্যেকের নাম-ঠিকানা লেখা আছে ওর ঐ নীল খাতায়। শুধু তাই নয় প্রত্যেক নামের জন্যে আলাদা একটি পৃষ্ঠা বরাদ্দ। ঠিক লেজারের পাতার মত। নামের পাশে অনেকগুলি ঘর কাটা। কোনটায় তারিখ, কোনটায় টাকার অঙ্ক। ক্রমিক নম্বরের পাতায় আরেকটি সংখ্যা বাড়ছে, আজ শিবতোষের নাম উঠবে এই খাতায়।

রান্নাঘর থেকে তাড়া এল সুজাতার চা হ'য়ে গেছে। প্রভাকর কাগজপত্র গুছিয়ে রেখে তক্তাপোশ থেকে নেমে পড়ল। উঠোনে কোট কেটে চাঁড়া চেলে চেলে চিৎকার ক'রে অঞ্জু মঞ্জু এক্কা দুক্কা খেলছিল। চেঁচামেচির চোটে কানে কিছু শোনবার উপায় নেই। লাফালাফির তালে তালে ওদের ঝাঁকড়া চুলের গোছা নাচছে কাঁধের ওপর। ধমক দিতে গিয়ে প্রভাকর ভাবল দু'টো মেয়েই মায়ের চুল পেয়েছে। রান্নাঘরে ঢুকে দেখল সুজাতা চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে বসেছে। আজ একটু সকাল ক'রেই সুজাতা গা' ধুয়েছে, চুল বেঁধেছে। ফিতে-কাঁটার বেণী করা খোঁপা নয়। বেঁধেছে হাতে জড়ান ফাঁপান আলগা খোঁপা। ঈষৎ হেঁট হয়ে

কেটলি থেকে কাপে চা ঢালছিল সুজাতা। সেই অবকাশে দু'এক গোছা চুল খোঁপা থেকে খুলে এসে ওর গালের ওপর ঝুলে রয়েছে। খোঁপার নিচে উন্মুক্ত মসৃণ একটু ঘাড়।

সেদিকে তাকিয়ে প্রভাকর হঠাৎ বলে উঠল—

'বাঃ, চমৎকার! বেড়ে মানিয়েছে কিন্তু।'

'চমৎকারের আবার কি দেখলে?' মুখ তুলে প্রশ্ন করল সুজাতা।

'দেখলাম তোমার খোঁপা বাঁধা। আশ্চর্য! শিবতোষের মনের কথা তুমি জানলে কি ক'রে। ওরও কিন্তু ঠিক এমনিটিই পছন্দ, এমনি আলগা খোঁপা।'

সুজাতা এ কথায় লজ্জা পেল না। ওর গাল লাল হয়ে উঠল না, চোখ নামল না।

ঠোঁট টিপে হেসে সুজাতা বলল—

'তুমিই বা কি ক'রে জানলে?'

'আমি জানি। ওকে যখন পড়াতাম, ও কবিতা লিখে লিখে আমাকে দেখাত। সে কবিতার বিষয় হ'ল একটি মেয়ে। মাথায় তার ভ্রমর কালো চুল, আর সে চুলের খোঁপাও হ'ল ঐ আলগা খোঁপা।'

'কিন্তু এ খোঁপার দাম উঠবে তো? প্রাণ ধরিয়ে দাম দেবে তো তোমার শিবতোষ?'

'দামটা কত শুনি আগে।' মিটি মিটি হাসে প্রভাকর।

'না মশাই, বেশি চাই না। দু'খানা বড় নোট উঠলেই খুশি।'

'মোটে দু'খানা!' প্রভাকর হেসে বলল, 'দু'খানা কেন ঢের বেশিই থাকবে, কিন্তু উঠে আসা সে তো তোমার হাতে। দেখি ক'খানা ওঠে আজ।'

সুজাতা বলল, 'বেশ। উপরি আয়ে কিন্তু ভাগ বসাতে পারবে না, তা আগে থেকে ব'লে রাখছি।' দু'টো ব্লাউজ, দু'টোই ছিঁড়ে ফাঁক। এ মাসে দু'টো ব্লাউজ আমার চাই।'

চায়ের কাপে ঠোঁট ছুঁইয়ে প্রভাকর জবাব দিল।

'ভাগ না দাও না দিলে, কিন্তু এ মাসটা স্রেফ বিড়ি টেনে মরেছি। এক প্যাকেট কাঁচি দিয়েও ভদ্রতা করোনি, এ কথাটা যেন মনে থাকে।'

এরা তৈরী হয়েই আছে, এখন অপেক্ষা শুধু কড়া নড়ার। শিবতোষ এসে যেমনি সদরের কড়ায় হাত ছোঁয়াবে অমনি সঙ্গে সঙ্গে যেন ভেল্কিবাজী খেলে যাবে বাড়ির মধ্যে। ঐ যে উঠোনে অঞ্জু মঞ্জু দুই মেয়ে চেঁচিয়ে বাড়ি মাৎ করছে ওরা চুপ করবে। চোরের মত গুটি গুটি দরজার দিকে এগিয়ে যাবে, কিন্তু দরজা খুলবে না। মরাল গতিতে হেলে দুলে এসে দরজা খুলে দেবে সুজাতা নিজ হাতে, নরম গলায় অভ্যর্থনা জানাবে আগন্তুককে। তার আগেই দেখা যাবে দু' লাফে এই ফালি উঠানটুকু পার হ'য়ে প্রভাকর গিয়ে সুজনি পাতা নড়বড়ে তক্তাপোশের ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে পড়েছে, মাথার দু'পাশে কনুইয়ের গাঁট ঠেলে ওঠা দু'টি হাত প'ড়ে থাকবে অসহায়ের ভঙ্গিতে। দু'টো পা'ই টান করা। একটি সামান্য নড়ছে চড়ছে, আরেকটি নিথর! হঠাৎ দেখে বোঝার উপায় নেই আসল ব্যাধি কোন পায়ে, কোন পা'খানা দিন দিন প্রভাকরকে পঙ্গু ক'রে আনছে। শিবতোষ উঠে আসার সঙ্গে সঙ্গে বাবা-মায়ের ব্যস্ততায় অঞ্জুর মত ঐটুকু ঐ মেয়ে পাশের ঘর থেকে ওদের দু'বোনে বসে পড়ার ভারি চেয়ারখানা মরতে মরতে পেটে বাঁধিয়ে টেনে নিয়ে আসবে। শিবতোষ যদি মানুষ হয়, ওর হৃদয় যদি পাষাণ

না হয় তা হ'লে সে চেয়ারে চেপে বসতে ওর কি একটু সঙ্কোচ হবে না, মায়া হবে না। কিন্তু ছেলে ছোকরা বয়স, ওদিকে যদি চোখ না-ই থাকে তারও ওষুধ আছে। দু'টি একটি কথার পরই প্রভাকর এক সময় দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে উঠবে, 'আমার তো দেখছ এই অবস্থা। আর ভূতের মত খেটে খেটে ভাবনা চিন্তায় আরেকজনের দেখো ঐ চেহারা! ওকেও প্রায় শেষ ক'রে এনেছি শিবতোষ।' কিন্তু এই নির্দেশের আরেকটি অর্থ আছে, আছে আরেক ব্যঞ্জনা। শিবতোষ বলছে, চোখ তুলে চাও ঐ মুখের দিকে। চেয়ে চেয়ে দেখো ওর টানা চোখ, ঠোঁট আর চিবুকের গড়ন। দেখো আর অবাক হও, পাগল হও। হ্যাঁ, ভিক্ষাই চাইছে প্রভাকর। এখন আর ওর কোন সঙ্কোচ নেই, লজ্জা নেই। যে যা পার দু' টাকা পাঁচ টাকা, যার যেটুকু শক্তি। তাতেই ওর কাজ হবে, পায়ের চিকিৎসা হবে। উপযুক্ত চিকিৎসা করাতে পারলে পা ভাল হতে কদিনই বা। পায় বৈকি প্রভাকর। এক-একজনের কাছ থেকে আশাতীত রকম আদায় হয়ে যায়। সবাই তো সমান নয়। মানুষের হৃদয় বলে একটা জিনিস এখনও আছে, এখনও তা নিঃশেষে ফুরিয়ে যায়নি দুনিয়া থেকে। আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবকে সেই হৃদয় খোলার সুযোগ দিচ্ছে প্রভাকর।

আট মাস হতে চলল প্রভাকরের চাকরী নেই। এই আট মাস এক আশ্চর্য অভাব্য উপায়ে এ সংসারের খরচপত্র ভরণপোষণ চলছে। সরকারী চাকরী খুইয়ে প্রভাকর কিছুদিন ব্যবসা করব করব ভয় দেখাল। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে দেখে যত্রতত্র দরখাস্ত পাঠাল। কোন ফল হ'ল না। অবশেষে একদিন সুজাতার

সুপারিশ চিঠি নিয়ে শ্বশুর বাড়ির সম্পর্কের এক বড় চাকুরের দ্বারস্থ হ'ল। সারা দুপুর কাটিয়ে শুকনো মুখে ফিরে আসতেই সুজাতা জানতে চাইল—

'কি হ'ল ?'

হাঁটুর কাপড় একটুখানি তুলে ধরে প্রভাকর বলল—

'দেখো কি হয়েছে।' ট্রাম থেকে নামতে গিয়ে পায়ে আঘাত নিয়ে ফিরে এসেছে প্রভাকর। হাঁটুর কাছে অনেকটা ছড়ে গেছে, গাঁটটা রীতিমত ফুলে উঠেছে।

সুজাতা থম্‌কে রইল কিছুক্ষণ। তারপর হলুদ চূণ গরম ক'রে এনে স্বামীর পায়ে প্রলেপ লাগাল। সে রাত্রে বিছানায় শুয়ে অনেকক্ষণ পর্যন্ত ওর চোখে ঘুম এলো না। নানা চিন্তায় ভাবনায় মাথাটা অসম্ভব ভারি হয়ে রইল সুজাতার। কেমন ক'রে সংসার চলবে, কি খাবে অঞ্জু মঞ্জু ? কি উপায় হবে ওদের ? কিন্তু বাঁচতে হলে উপায় তো খুঁজে বার করতেই হবে। রাত জেগে জেগে সুজাতা এক চিঠি খাড়া করল। ওর এক মেজদা আছেন দিনাজপুরে। বিনা ভূমিকায় সুজাতা তার মেজদাকে লিখল। 'মেজদা এক মহা বিপদে পড়ে আজ তোমাকে চিঠি লিখছি। আর একটু তলিয়ে ভেবে দেখলে এ বিপদ তোমাদেরও। কাল অফিস থেকে ফেরার পথে গাড়ি চাপা পড়ে উনি পা ভেঙ্গে বাসায় এসেছেন। অফিস চুলোয় যাক্ এখন পা'খানা বাঁচে তো রক্ষা পাই। ডাক্তারে যে রকম ভয় দেখাচ্ছে তাতে শেষ পর্যন্ত ভাগ্যে কি আছে জানি না। তিন-চারটি পেট নিয়ে তোমাদের কারো ঘাড়ে গিয়ে যেন না পড়তে হয়, তোমরা এই আশীর্বাদটুকু আজ আমায় করো। আর যেভাবে পার ধার ক'রে হোক, ভিক্ষা ক'রে হোক চিঠি পেয়েই একশটা টাকা আমায় পাঠিয়ে

দিও। এখন আমার অভিমান অপমানের সময় নয়। যাদের কাছে চাওয়া যায় না তাদের কাছেও হাত পেতেছি। সব সম্বল দিয়ে আমি একবার শেষ চেষ্টা ক'রে দেখতে চাই।' তারপর কুশল প্রশ্ন সেরে ইতি দিয়ে চিঠিতে সই করল, 'তোমাদের সুজাতা।'

আশ্চর্য! টাকা এলো। একশ টাকা না হোক পঞ্চাশ টাকা এলো ঠিক হিসেব করা দিনের মাথায়। সুজাতার মগজের তারিফ না ক'রে পারল না প্রভাকর। সেইদিন থেকে চিঠি চলল নতুন পুরোন অনেক আত্মীয়ের কাছে, জানা, আধা-জানা বন্ধুবান্ধব কেউ বাদ গেল না। নাম ঠিকানার একটা রেজিস্টারী তৈরী ক'রে ফেলল প্রভাকর। চিঠির নকল রাখল, সময়মত রিমাইণ্ডার পাঠাল। কেউ দূর থেকে দু'পাঁচ টাকা পাঠিয়ে এড়াতে চাইল, কিন্তু প্রভাকর নাছোড়বান্দা। চিঠির পর চিঠি যেতে লাগল সেই ঠিকানায়। প্রভাকরের পা ততদিনে প্যারালিসিসের কবলে গিয়ে পড়েছে। ওর সব চিঠিরই শেষ কথা ঐ একটি, একদিন হয়ত গোটা পা'টাই এমনি ক'রে অবশ হয়ে যাবে, একমাত্র আশঙ্কা প্রভাকরের। তোমরা ওকে চেষ্টা ক'রে দেখবার একটু সুযোগ দাও। কেউ কেউ বাসায় এসে দেখেও গেল। দয়া ক'রে যারা এল ওর এই অসহায় অবস্থা দেখে একেবারে নিরাশ করতে পারল না।

একেক দিন সুজাতা হেসে বলে, 'তোমার এ জারিজুরি একদিন ভাঙ্গবে। ভাব মগজ কেবল তোমার আর তোমার বউয়ের আছে, আর কারো মাথায় বুঝি কিছু নেই।'

প্রভাকর জবাব দেয়।

'মগজ যেমন আছে, হৃদয়ও তো আছে। আমার এই দশা দেখে মানুষ যে তার চোখে জল আসবে না? আর সে চোখ যদি এতই

শুকনো তা হ'লে তার ওষুধও তো আমার সামনে দাঁড়িয়ে। কই একবার চেয়ে চোখ ফিরাক দেখি। কেমন ক্ষমতা।'

সুজাতা অবশ্য সেদিন লজ্জা পেয়েছিল। মুখ নামিয়ে বলেছিল, 'যাও, তোমার কেবল বাজে কথা।'

কিন্তু সে লজ্জা কেটেছে অনেকদিন, সে চোখ উঠেছে। না উঠে উপায় কি? বেঁচে তো থাকতে হবে, টিকে তো থাকতে হবে।

সদর দরজায় কড়া নড়ে উঠল। এতক্ষণে সময় হ'ল শিবতোষের। এক পা, দুই পা ক'রে এসে দরজার হুড়কো খুলে দাঁড়াল সুজাতা। ওমা কোথায় শিবতোষ? এ দেখি শিবতোষের বদলে শিবরাম এসে উপস্থিত! ছেলেটিকে চিনতে সুজাতার দেরী হ'ল না। নগরকান্দার জগদীশ। সিরাজগঞ্জে বাসা থাকতে কয়েকমাস ওদের বাসায় খেয়ে স্কুলে পড়ত জগদীশ। বেশ কয়েক বছর আগের কথা। জগদীশের বয়স বেড়েছে, মাথায় অনেকটা উঁচু হয়েছে, কিন্তু বেশবাস আগের মতই। আগের মত চাল-চলন। শিবরাম নয়ত কি? শেয়ালের গায়ের রংয়ের একটা ঢোলা পাঞ্জাবি চড়িয়েছে। হাতে বাঁকান বাঁশের বাঁটের ছাতা একটা। চূড়ার ওপর ময়ূর পাখা! কতকাল যেন চুল কাটে না। কান পর্যন্ত চুলে ঢাকা পড়ে গেছে। শিবতোষের বদলে জগদীশ। পোনার বদলে তিত্‌পুঁটি! আসুক তাই আসুক। যথালাভ। এদিকে বাড়ি ভাড়ার তারিখ আসন্ন। বাজার খরচে টান পড়েছে। দু'টো টাকাই বা আসে কোত্থেকে?

দরজার পাল্লা টেনে ধরে সুজাতা ডাকল—

'এসো ঠাকুরপো।' ডাক তো নয়, যেন বাঁশী বেজে উঠল।

ঘরে ঢুকে সুজাতা নিজে হাতে চেয়ার টেনে নিয়ে এল। কিন্তু জগদীশ চেয়ারে বসল না। প্রভাকরের খাটের এক পাশে জড়সড় হয়ে সে সঙ্কোচে কুঁচকে রইল। ওর আপাদমস্তক একবার দেখে নিয়ে প্রভাকর চোখ বুজে বলল, 'আমি জানতাম, তোর কানে খবর গেলে তুই আসবি, না এসে পারবি না।' মনে মনে ভাবল, ওতো এসেছে। কিন্তু ওর পিছনে স্ট্যাম্প খরচাটাই জলে গেল। পকেট ঝেঁটালে তু'টো টাকাও হয়ত বেরোবে না। এসেছে, তু'চার বার আহা উহু ক'রে চলে যাবে। তবু পারে তো একবার শেষ চেষ্টা ক'রে দেখুক সুজাতা। যদি কিছু থেকে থাকে। কৌশলে ওর অবস্থাটা একটু জেনে নিতে চাইল প্রভাকর,

'তারপর আছিস্ কোথায় ?'

থাকবে আর কোথায়। আছে উল্টোডাঙ্গার করবাগানে এক মুসলমানের ছাড়া বাড়িতে। তাছাড়া আর জগদীশদের জায়গা কোথায় কলকাতায় ?

'কি করিস্ আজকাল ?'

জগদীশ সলজ্জ একটু হাসল।

'সে আর শুনে কাজ নেই প্রভাদা, একেবারে ক্ষেতে নেমেছি। কাছেই এক তেল কলে সরষের বস্তা গুণছি আজকাল। ফাঁক পেলে খতেন যাবেদা নিয়েও বসতে হয়। আর যা করতে হয় তা আর জিজ্ঞেস করো না।'

'মাইনে পাস্ কত ?' প্রভাকর থেমে থেমে বলল কথাগুলি, ওর আর শোনবার প্রবৃত্তি নেই।

'মাইনে রোজ আড়াই টাকা। অথচ খাইয়ে আটটি। বিধবা হবার পর থেকে বড়দি তার ছেলে নিয়ে তো আমার কাছেই বরাবর।

পিসীমা এতদিন পাকিস্তানে ছিল এখন সেও আমার গলার ওপর। কাকে ফেলি প্রভাদা? ফেলনা তো কেউ নয়? কিন্তু তুমি পড়েছ কতদিন? দেখি তোমার পা—'

আর পা! কি হবে পা দেখিয়ে—প্রভাকর আশা ছেড়ে দিয়েছে। তবু জগদীশ এগিয়ে এসে পা'য়ে হাত বুলাল কিছুক্ষণ, তারপর বলল—

'দেখো দেখি কি বিড়ম্বনা। সিরাজগঞ্জ থাকতে তোমার এই পায়ের শটে বল মাঠ পেরিয়ে যেত, আর আজ সেই পায়ের কি দশা! তোমার তো বাঁ পা'ই ভালো চলতো, তাই না প্রভাদা?' তারপর একটু থেমে বলল, 'না, ওসব কোবরেজ টোবরেজের কম্ম নয়, তুমি ভাল ডাক্তার দেখাও, এ পা তোমার ঠিক সেরে যাবে।'

রাগে গা জ্বলে গেল সুজাতার। ভাল ডাক্তার দেখানোর উপদেশ দেয়া হচ্ছে, টাকা বার কর। ভাল ডাক্তার আসে কোত্থেকে? কাছে এসে সুজাতা ঠিক ওর পাশে বসল। পারে তো হাত ধরে মিনতি করে। 'কিন্তু টাকা কোথায় ঠাকুরপো। বিনে টাকায় তো আর ডাক্তার দেখানো যায় না। টাকা কোথায় পাব বল।' এ কথার কি জবাব দেবে জগদীশ সুজাতার তা জানতে বাকী নেই। আজ আর কিছু হবার আশা নেই। তবু এত সহজেই কি জগদীশ ছাড়া পাবে। হ'লই বা তেল কলের দিনমজুর দীনহীন জগদীশ। ওকে একটু ছোঁয়াচ দিয়ে দেওয়া যায় না। যাতে ও অন্ততঃ আসে আরেকদিন?

সুজাতা তাড়াতাড়ি বলে উঠল—

'চল ঠাকুরপো। ও ঘরে একটু চা খাবে চল। কতকাল পরে এলে, কতদিন পরে দেখলাম! অনেকদিন তোমার কথা বলাবলি করেছি দুজনে।'

কিন্তু জগদীশ তো চা খায় না। শুধু চা কেন, পান বিড়ি কিছুই সে খায় না। তার কোন নেশা নেই।

প্রভাকরের দিকে তাকিয়ে জগদীশ বলল—

'উঠি এবার প্রভাদা, বরং আরেকদিন আসব, আর—'

আশ্চর্য! জগদীশের পকেট থেকে টাকা বেরোচ্ছে। দু' এক টাকা নয়, এক টাকার কতগুলি জীর্ণ নোট।

'আর এই কুড়িটা টাকা আপনি রাখুন বৌদি। দরকারের তুলনায় এ কিছুই নয়। সাগরে শিশিরের ফোঁটা। তবু যে যা পারি—'

জগদীশের হাত কাঁপতে লাগল। ওর মুখে ঘামের ফোঁটা। সুজাতার চোখে পড়ল, কি এক উত্তেজনায় ওর মুখ আরক্ত হয়ে উঠেছে। হৃদয় খুলল জগদীশের!

প্রভাকর শুয়ে শুয়েই হাঁ হাঁ ক'রে উঠল, 'ও টাকা তুই ফিরিয়ে নে জগদীশ। ও টাকা আমি রাখতে পারব না। না না, কিছুতেই না।'

জগদীশ ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে। ছাতার জন্য হাত বাড়িয়েছে। হেসে বলল—

'কিন্তু ও টাকা তো আমার নয় প্রভাদা, ও টাকা তোমার বৌমার।' তারপরে ফের বসে পড়ে কুড়ি টাকার ইতিহাস বলে শেষ করল।

কুড়িটা টাকা তো শুধু নয়, জগদীশের বৌয়ের হাজার ফোঁটা ঘাম ঐ নোটের সাথে মিশে রয়েছে। রাত্রের কাজকর্ম চুকে যাওয়ার পর জগদীশের বৌ বসত বিড়ির ডালা নিয়ে। 'মাথার কাছে কেরোসিনের ডিবের আলোয় অতিষ্ঠ হয়ে একেকদিন তেড়ে মারতে গেছি প্রভাদা। কিন্তু মেয়েছেলের পয়সার লালচি। তাকে রুখবে

কার সাধ্য! তারপরে ভাবলাম বাঁধে বাঁধুক। নিজে হাতে ক'রে এক পয়সা তো কোনদিন দিতে পারব না। কিন্তু তোমার চিঠি শুনে ও বলল, তুমি যাও। আমার কাছে যা আছে বের ক'রে দিচ্ছি, আরেকটু বেশি রাত জাগতে পারলে ও টাকা আমি পুষিয়ে নেব। একদিন ওঁদের ভাত খেয়েছ। এই বিপদে বসে থেকো না। তুমি যাও। ভাব দেখি একবার দিদির দশাটা।'

বিদায় নিয়ে উঠোনে নামল জগদীশ। সেদিকে উঁকি মেরে তাকিয়ে দেখে প্রভাকর উঠে বসল বিছানার ওপর। যাক্, কিছু তো আদায় হ'ল। কিন্তু ওকে আবারও আনতে হবে। যাওয়ার সময় আবার ওকে একটু কাতরানি শুনিয়ে দাও। যেন ভুলে না যায়, কানে যেন বিঁধে থাকে জগদীশের। 'উহুহু গেছি গেছি' ক'রে কাতর ধ্বনি ক'রে উঠল প্রভাকর আর যেন অভ্যাস মতই ফিরে বসে ওর হাঁটুর ওপর সুজাতা হাত রাখল। কিন্তু কেমন যেন বিমনা হয়ে গেছে সুজাতা। শিবতোষের উদ্দেশ্যে, তার মনের মত ক'রে বাঁধা আলগা খোঁপা ভেঙে পড়েছে কাঁধের ওপর। ওর চোখে ভাসছে করবাগানের এক বস্তী-বউয়ের পা ছড়িয়ে বসে বিড়ি বাঁধা। তার হাতে বিড়ির কুলো। আর ওর হাতের নিচে প্রভাকরের সুস্থ স্বাভাবিক পায়ের গাঁট। সেই গাঁটের ওপর হাত রেখে সুজাতার মনে হ'ল এর চেয়ে প্রভাকরের পা যদি সত্যি সত্যিই প্যারালাইসড হয়ে যেত! পঙ্গু হয়ে থাকত প্রভাকর।

হাঁটু ঝাঁকিয়ে সুজাতার হাতে একটা ঠেলা দিয়ে প্রভাকর উঠে বসল, তারপর বলল—

'নাও, ভাল ক'রে আবার একটু চা কর দেখি। মৌজ ক'রে খাওয়া যাক্।'

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে সুজাতা ঝাঁঝিয়ে উঠল।

'লজ্জা করে না তোমার? নির্লজ্জ বেহায়া পুরুষ কোথাকার।'

প্রভাকর এক মুহূর্ত চুপ ক'রে রইল তারপর বাঁকা হাসি হেসে বলল—

'ওঃ, এই কথা। খুব তো ঢলাতে গেছলে। শেষ পর্যন্ত জগা ছোঁড়াটা মজিয়ে গেল বুঝি।'

প্রভাকরের কথার কোন জবাব দিল না সুজাতা। বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল শুধু, প্রভাকর ঠিকই বলেছে, জগদীশ সত্যিই আজ ওকে মজিয়ে গেল।

ফটকের ঠিক সাম্‌নে দাঁড়িয়ে নীরদ আরেকবার চেয়ে দেখল বাড়িটার দিকে। 'শান্তিধামের' এ আরেক রূপ। গেটের মাথায় নহবৎখানায় সানাই বাজছে, ভারি মিষ্টি একটা সুর। চারদিকে মালার মত ক'রে লাল নীল ইলেকট্রিক বালব্‌ ফিট্‌ করা হয়েছে। একবার লালটা জ্বলে, আবার জ্বলে নীলটা, হয়ত বা ছুটোই একসময় জ্বলে উঠল। রংবেরঙের শাড়ির ঝলক দিয়ে মেয়েরা এসে ঢুকছে। তাদের চাপা হাসির শব্দ, সোনার চুড়ির টুংটাং আর সব কিছুর পিছনে সানাইয়ের এই মিষ্টি একটানা একটা সুর। মনে মনে তারিফ করল নীরদ, 'বাঃ, আয়োজনের কোথাও কোন ত্রুটি নেই। মেয়ের বিয়েতে কিপ্টে বুড়ো টাকা ঢালছে তাহলে।'

ঢুকেই বাঁ হাতের ঘরটায়, যেখানে রোজ এই সময় রায়মশায় একগাদা কাগজপত্রের মধ্যে নাক ডুবিয়ে বসে থাকেন সেটা আজ খালি। তাঁর প্রকাণ্ড ইজিচেয়ারে নীরদ গা এলিয়ে দিল, সে অবশ্য সোজা উপরে উঠে যেতে পারত। এ বাড়ির সব ঘরই তার চেনা, সবাই জানাশোনা। কিন্তু একবার দেখতে পেলেই সকলে এসে যেন ছেঁকে ধরবে, হাজার প্রশ্ন একসাথে। সবচেয়ে দুঃসহ লাগে মেয়ে ছুটোকে, ঢংয়ে যেন গলে পড়বে গায়ের উপর। তার আগে এখানে এই নিরিবিলিতে বরং একটা সিগারেট টেনে নিতে পারলে বেশ হয়। কেস্‌ খুলে সিগারেট ধরাল নীরদ। মাথার উপর ফ্যান ঘুরছে। আজ একটু বে-হিসেবী খরচ করছেন রায়মশায় বোঝা

গেল, নইলে তাঁর এই ফ্যান্ ঘোরে হিসেব মাফিক। তাঁর টেকো মাথা ঠাণ্ডা রাখার জন্য যতটুকু বাতাসের দরকার তার এক মিনিট বেশি বাজেখরচ হ'তে পারে না কোনদিন, অন্ততঃ নীরদ যে কদিন এ বাড়িতে এসেছে গেছে। ফ্যানের ঠিক সোজা নিচে কাগজপত্রের আড়ালে একটা রূপার য়্যাসট্রে চিক্ চিক্ করছে। নীরদের দৃষ্টি নেমে এল তার উপর। হালে কেনা, হয়ত বিয়ে উপলক্ষেই। হাত বাড়িয়ে নীরদ ওটাকে মুখের কাছে নিয়ে এল। ফুঁ দিয়ে ছাইয়ের গুঁড়ো-গুলো উড়িয়ে দিল। বাজারে ছাড়লে কমসে কম ছুটি টাকা। আর মিষ্ট্রেস্ মীনাদি যদি নেন, সেদিনও তিনি বলেছেন, 'বেশ ভাল দেখে একটা য়্যাস্‌ট্রে কিনে দিও তো নীরদ। মেসে নানা লোক আসে যায়, এখানে ওখানে ছাই ফেলে ঘর একাকার, কিছু বলতেও পারিনে, ওর একটা থাকলে তবু সাম্‌নে এগিয়ে ধরতে পারি। তুমি একটা কিনেই এনো বরং ;' তিনি নিলে চার টাকায় পার হয়ে যাবে। শব্দ হবার ভয় নেই, তবু নীরদ ভাল ক'রে রুমালে মুড়ে ওটাকে বাঁ পকেটে চালান ক'রে দিল।

দোতলার সিঁড়ির মোড়ে প্রথমেই দেখা হ'ল উর্মিলার সাথে। রায়মশায়ের দ্বিতীয় মেয়ে, নির্মলার বোন উর্মিলা। সিঁড়ির রেলিংয়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নীরদকে দেখে বলল, 'যাক্ নীরুদা এলে এতক্ষণে !'

মুখে এর বেশি কিছু সে বলল না, কিন্তু চোখের তারায় ওর হেলে-পড়া দেহের ভঙ্গি দিয়ে আরও যেন কি জানাতে চায় উর্মিলা। নীরদের সে ভাষা জানা আছে। ফিকে নীল রঙের একটা শাড়ি জড়িয়েছে মেয়েটা। আধুনিক ঢংয়ে কপালের উপর ছু'পাশে চুল একটু

ফাঁপান, পিটপিটে চোখের নিচে কাজলের মোটা টান, পাউডারের ঘন প্রলেপে মুখের আসল রং ধরার উপায় নেই। চারদিকে তাকিয়ে নেয়ার ভান ক'রে নীরদ চাপা গলায় বলল 'চমৎকার মানিয়েছে কিন্তু শাড়িটায়।' এইটুকুতেই ভারি খুশি, যেন খুশিতে গলে পড়ে ঊর্মিলা, কথা বলতে পারে না অনেকক্ষণ। ফিস্‌ফিস্ ক'রে আরও দু-একটি কথা বলে' আরেকটু সোহাগ জানিয়ে নীরদ যতক্ষণ ইচ্ছে ওকে এখানে দাঁড় করিয়ে রাখতে পারে, এসব কায়দা-কানুন তার জানা আছে।

আরেক ঘরে নির্মলা সাজছে বিয়ের সাজে। লগ্ন ভোর পাঁচটায়, গোধূলি নয় ঊষালগ্ন। রাত একটু থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে। যে শুনেছে সেই একবার মুখ গুঁজে হেসেছে। রায়মশায়ের পাগলামি নয়ত কি? আর দিন খুঁজে পেলেন না তিনি। তবে একদিক দিয়ে সুবিধে আছে তাড়াহুড়ো নেই কোন কিছুর। ধীরেসুস্থে যা ইচ্ছে হয় কর, যতক্ষণ খুশি বসে বসে সাজাও মেয়েকে। গোলগাল মোটা একখানা হাত বাড়িয়ে ধীরে-সুস্থেই কে যেন চন্দনের ফোঁটা কেটে দিচ্ছে নির্মলার মুখে। যেতে যেতে নীরদ আড়চোখে চেয়ে দেখল একবার; নিটোল কনুয়ের খাঁজে আর্মলেটটা কেটে বসে আছে, হাত নাড়ার সাথে সাথে মৃদু দোল খাচ্ছে সোনার ছোট্ট ঘণ্টিটা। আর্মলেট নীরদের মোটেই পছন্দ নয়। এ গয়না কেমন যেন বিশ্রী লাগে তার কাছে, এর চেয়ে সেকেলে মোটা অনন্ত ছিল ঢের ভাল। কিন্তু সোনা এতেও কম নয়, মনে মনে আঁচ নিয়ে দেখল নীরদ দুটোতে আড়াই ভরি হয়ত হবে, বা তারও বেশি। মেয়ে সাজানোর আর দেখবার কি আছে? কিন্তু মেয়েকে যারা সাজিয়ে দিচ্ছে তাদের গায়ের দিকে চাইলে চোখ জুড়িয়ে যায়, জড়োয়ার এমনি ছড়াছড়ি।

'এই তো নীরদ এসে গেছে, যাক্ বাঁচা গেল।'

রায়মশায় কখন পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন, 'মাংসের ওখানটায় তোকে একটু যেতে হচ্ছে বাবা, ব্যাটা ঠিকে ঠাকুর দিয়ে কিছু বিশ্বেস আছে। হাজার বলুক ওরা, আমার তো কেবল ভয় দিলে বুঝি ধরিয়ে।'

আমাদের নীরদ কিন্তু ওতে পাকা ওস্তাদ। কালিয়া বল কোরমা বল সব জানে। প্রসন্ন দৃষ্টিতে মেয়েদের দিকে তাকালেন রায়মশায়। তারা চাইল নীরদের দিকে। সোনার ঘন্টির দোল তখন থেমে গেছে।

এখানে ওখানে খবরদারি ক'রে নীরদ এক ফাঁকে বড়বৌর ঘরে চলে এল। বাড়ি থেকে এ ঘরটা যেন একেবারে আলাদা। বাইরে বনবিহারী যেমন পাশাপাশি আলাদা ফার্ম খুলে বাপের উপর টেক্কা মেরেছে, মল্লিকা তেমনি মুনাফার ষোল আনা রস টেনে এনেছে দোতলার এই কোণের ঘরটায়। বাড়িতে পা দেয়ার আগেই এ ঘর যেন ব'লে ওঠে 'আমায় দেখ'। ঝকঝকে, তক্‌তকে ফার্ণিচার, মাঝখানে আয়না বসান সেগুনের আলমারি, জানালার তলায় মল্লিকার ড্রেসিং টেবিল, সেন্ট পাউডার বিলাতী স্নো ক্রীমে ভরা। কাজের বাড়িতেও এঘরে কাউকে ভিড় করতে দেয়নি মল্লিকা। এস বস, আয়নার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে শাড়ি গুছিয়ে নাও, পর। দরকার হলে চিরুণী চালিয়ে চুল ঠিক ক'রে নাও ব্যস। কিন্তু তার বেশি নয়, অযথা ভিড় ভাল লাগে না মল্লিকার। এইমাত্র কাদের যেন বিদায় ক'রে দিয়ে এল মল্লিকা।

তারপর নীরদের দিকে তাকিয়ে বলল—

'ঘুরে ঘুরে আর পারি না নীরদ। কেউ এল তো অমনি বৌদি চলুন আপনার ঘরে।'

'এ ঘরে মধু আছে ওরা জানে।'

'তার মানে?' মল্লিকা হাসে একটু।

'মানে?'

ভ্রূভঙ্গি ক'রে তাকায় নীরদ আর লুকিয়ে বড় আয়নার মধ্যে নিজের ছবিটা দেখে নেয়।

'মানে, আয়নার দিকে চান। তাকানই একবার।'

'যাও ফাজিল, কেবল ইয়ারকি, দাঁড়াও তোমার দাদাকে ডেকে আনছি।'

'তা আনবেন, কিন্তু একটু পরে বৌদি।' নীরদ মিনতি করে, নিচু গলায় বলে, 'আপনাকে চমৎকার মানিয়েছে কিন্তু শাড়িটায়।'

মল্লিকা আবার ধমকে ওঠে জোরে। কিন্তু চাই না চাই না ক'রেও ফিরে ফিরে চোখ গিয়ে পড়ে আয়নার উপর; পছন্দ আছে ছেলেটার। নীরদ কখন সরে গিয়ে ড্রেসিং টেবিলে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছে, হাত দুটো পিছনে নিয়ে আড়মোড়া ভাঙল একবার আর আলগোছে বিলাতী সেন্ট একটা ডান পকেটে চলে এল, বাঁ পকেটের ভারসাম্য রক্ষা হ'ল এতক্ষণে। চড়তির বাজারে দুর্লভ জিনিস। পাঁচ টাকায় যে পাবে লুফে নেবে। ওস্তাদের হাত নীরদের, এমনি ক'রে দশ মিনিট ঘুরতে ফিরতে পারে যদি সমস্ত ঘরটায় নীরদ তাহলে একটা কেন অমন দু-চারটাকে অনায়াসে পকেটে চালান ক'রে দিতে পারে! বুকের মধ্যে টিপ্ টিপ্ নয়, দপ্ দপ্ নয়, সরু আঙুল ক'টা এটা ওটার উপর নড়েচড়ে বেড়াবে শুধু।

মল্লিকার আজ সত্যি এক জায়গায় দু' মিনিট দাঁড়াবার যো নেই, অনীতার ঘরে আবার ডাক পড়ল তার।

'নাঃ, আর পারা যায় না বাপু, একটু যদি চোখের আড়াল হলেম অমনি ডাক তাকে, আমি ছাড়া যেন মানুষ নেই এ বাড়িতে।' বিরক্তি লাগে মল্লিকার।

'চল না নীরদ ওর ঘরে প্রেজেন্টগুলিই তো তোমাকে দেখান হয়নি এখনও।'

আর কেউ হ'লে তাক্ লেগে যেত কিন্তু নীরদ এসব অনেক দেখেছে, বড় বড় বিয়ের এ আরেকটা অঙ্গ। পয়সা ফেলার এক প্রাণান্তিক পাল্লা চলে এখানে। দামের দিক দিয়ে নতুনত্বের দিক দিয়ে কে কাকে ছাড়িয়ে যাবে তারই পাল্লা। ছোটখাট একটা এগজিবিসান লেগে গেছে যেন। ফুলদানী, টি-সেট, রঙীন্ জ্যাকেট মোড়া বই। রূপার মিনে করা হাঁসের পিঠের সিঁদুরদানী গোটা পাঁচ-ছয়। মেয়েরা ভিড় ক'রে আছে। এটা ওটা নেড়ে চেড়ে দেখছে কেউ, আর চারদিকে ছড়ান জিনিসপত্রের মধ্যে পা মুড়ে বসে আছে অনীতা। কেউ কোন জিনিস দিয়ে গেলেই সঙ্গে সঙ্গে পেন খুলে স্লিপে টুকে নিচ্ছে। মল্লিকাকে দেখে অনীতা উঠে দাঁড়াল।

'নাও এবার তুমি একটু বস দিদি ; উঃ, বসে বসে কোমর ধরে গেল আমার।'

মল্লিকাই আলাপ করিয়ে দিল।

'আমার মাসতুত বোন, অনীতা। বহরমপুর কলেজ থেকে আই. এ. দিচ্ছে এবার। আসবে না কিছুতেই, আমিই ধরে বেঁধে আনিয়েছি।' তারপর নীরদের দিকে চেয়ে বলল, 'আর এ হচ্ছে আমাদের নীরদ। নীরদ বরণ। আগে এ বাসায়ই থাকত।'

নীরদ আপত্তি তুলল। হেসে বলল, 'শুধু এইটুকু। গুণাগুণ আর কিছু নেই বুঝি আমার?'

'আছে। কিন্তু সে পরিচয় দিতে গেলে তো অনেক কথা বলতে হয়, তার চেয়ে আছে। তো প্রায় সারারাতই। অনীতাও রইল, ক্রমে সেটা জেনে নিলেই চলবে। না, কি বলিস অনু?' মল্লিকা চোখ টিপে একটু হাসল।

অনীতা ভাল ক'রে চোখ তুলে তাকাতে পারে না লজ্জায়। চমৎকার চেহারা নীরদের—মুগার ঢোলা পাঞ্জাবির নিচে রং যেন ফেটে পড়ছে, ইয়ারকি ক'রে যখন চোখ নাচায়, মসৃণ কালো তুটি ভুরু ঠিক কালো প্রজাপতির তু'টি পাখার মত কেঁপে কেঁপে ওঠে।

হঠাৎ অনীতার দিকে চেয়ে চোখ জ্বলে ওঠে নীরদের। বুক-কাটা। ব্লাউজের মাঝখানে সোনার ক্লিপ আঁটা লাইফ্-টাইম সেফার্স একটা ক্লিপের ঠিক মাথার উপর ছোট্ট শ্বেতবিন্দু, দীর্ঘজীবনের অভ্রান্ত প্রতীক। দামী কলম। কত দাম উঠতে পারে ওর একটার; ষাট? সত্তর? না তারও বেশি। ঘুরেফিরে যতবার চোখ পড়ে ওটার উপর নীরদের দশ আঙুলের মধ্যে শির শির ক'রে ওঠে, যেন পিঁপড়ে হেঁটে বেড়াচ্ছে। কিন্তু বড় শক্ত আশ্রয়ে বন্দী হ'য়ে আছে কলমটা। ও জায়গায় নীরদ হাত দেবে কি ক'রে? সময় চাই, ভাল একটা সুযোগ চাই তার আগে।

কিছুক্ষণ বাদে কি একটা জিনিসের খোঁজে দিদির ঘরে ঢুকে অনীতা দেখল নীরদ এসে পিছনে দাঁড়িয়েছে। নীরদ প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আছে অনীতার। ওর কেমন যেন ভয় ভয় করে, বাড়িভরা লোক, কে দেখে ফেলবে, কি ভাববে ঠিক কি? কিন্তু চমৎকার গায়ের রং নীরদের। ফিরে দাঁড়িয়ে অনীতা বলল—

'হঠাৎ কেউ দেখলে কি ভাববে বলুন তো ?'

'কে দেখল না দেখল সেদিকে সত্যি চোখ দিতে পারছি না। আমি দেখছি অন্য জিনিস।' নীরদ মিষ্টি ক'রে হাসল একটু।

খাটের একপাশে উঠে বসল অনীতা।

'কি দেখছেন আপনি ?' চোখ বাঁকিয়ে অনীতা প্রশ্ন করল।

'দেখছি ভারি আশ্চর্য দুটি চোখ।'

'যান।' দুটি হাত কোলের উপর এনে লজ্জায় অনীতা মুখ ফিরাল। বুকের কলমটা বুঝি একটু ঘাড় কাত করল সেইসঙ্গে। নীরদের দৃষ্টির অনুসরণ ক'রে অনীতা লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। অন্য কোন সময় হলে, আর অন্য কোন পুরুষ হ'ত যদি, তাহলে হয়ত ভয়ানক ভালগার মনে হ'ত ওর কাছে। গায়ের মধ্যে ঘিন ঘিন ক'রে উঠতো অনীতার। কিন্তু নীরদের মুগ্ধ, লোভাতুর চোখের দিকে চেয়ে সমস্ত মন যেন মমতায় ভরে ওঠে। বাধা দিতে মন সরে না। মনের মধ্যে নীরদের কথাগুলিই গুনগুন করতে থাকে। ভ্রমর-কালো ভুরুর নিচে অপূর্ব সুন্দর দুটি চোখ। লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে থাকে অনীতা। আর নীরদ মনে মনে ভাবে 'ওষুধে ধরেছে তা হলে। কিন্তু সে শুভ মুহূর্তের সুযোগ কোথায় ?'

গেটে পর পর হর্ণের শব্দ, বর এসে গেল। মুখে মুখে খবর পৌঁচাচ্ছে একতলায়, দোতলায়, ছাদের উপর, চিলে কোঠায়; দোতলায় প্যাসেজ দিয়ে সিঁড়ির উপর মেয়েরা ভেঙ্গে পড়ছে। ঠাসাঠাসি ভিড়। কে কার আগে নামব করতে গিয়ে নামতে পারছে না কেউ। একতলায় সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে রায়মশায় হাত উঁচিয়ে অধীর ব্যস্ততায় খুঁজছেন নীরদ কোথায় ? ঠেলে ঠুলে

কোনমতে পথ ক'রে দ্রুত নিচে নেমে আসছিল নীরদ। পাঞ্জাবির ঢোলা হাতার ঝাপটা লেগে কার যেন চশমা পড়ে যেত আরেকটু হলে। মুখ নিচু ক'রে নরম গলায় মাপ চাইতে হ'ল। অনীতার গায়েও কি ছোঁয়া লাগল একটু? সেও তো সিঁড়ির মুখে এসে দাঁড়িয়েছে।

পাকা হাত নীরদের। আনন্দে নিজের আঙুলের ডগায় ওর চুমু খেতে ইচ্ছে করে। কত আলগোছে চোখের পলকে কলমটাকে এনে কোমরে গুঁজে ফেলতে পারল।

নীরদকে কাছে পেলে রায়মশায়ের আর কোন ভাবনা থাকে না। তুখড় ছেলে, আর এমন চট্‌পটে। বরকে মোটর থেকে নামিয়ে নিয়ে এল, সাথে যাঁরা এসেছেন তাঁদের অভ্যর্থনা করল। পান, সিগারেট, দেশলাই যেখানকার যা সব রেডি। চা এনে ফেলবে এক মিনিটে। কারো কিছু দেখতে হবে না আর।

তবু প্রথম চোটটা সাম্‌লে দিয়েই নীরদ খেয়েদেয়ে চলে যাওয়ার ছুটি চাইল। ভয়ানক জরুরী কাজ আছে সকালে। মেসে না ফিরলেই নয়। তা সে যত রাতেই হোক্‌।

রায়মশায় হাসলেন।

'শোন কথা পাগলের। ভারি তো কাজ। খেয়ে নিতে চাও নাও। কিন্তু তোমার ছুটি কাল, বাসি বিয়ের পর। ছুটি চাইলেই ছুটি দিয়ে দিলুম আর কি!'

অগত্যা নীরদকে থেকে যেতে হয়।

অনীতা যখন টের পেল কলম নেই সঙ্গে, তখন রাত হয়েছে। নিমন্ত্রিতের আসা-যাওয়া হয়েছে মন্থর। সানাই বাজছে থেমে থেমে

আস্তে আস্তে। লগ্ন সেই ভোর পাঁচটায়। এরই মধ্যে চোখ ঢুলে আসছে অনেকের। সমস্ত বাড়ী যেন ঝিমিয়ে পড়ছে। মল্লিকার কোন এক বান্ধবীর ঠিকানা লিখে নিতে গিয়ে কলম খুঁজে পেল না অনীতা। কোথায় রাখল কলমটা? মল্লিকার ঘর খুঁজে দেখল। টেবিলের উপর নেই। ড্রয়ারের মধ্যেও নেই। যে ঘরে বসে লিস্ট রাখছিল সেখানেও পাওয়া গেল না। অনীতার নিজের নয়—ছোড়দার কলম। কোথাও যদি খুঁজে না পাওয়া যায়! উঃ, সে কথা ভাবতেও পারে না সে, তবে কি ঊর্মিলার পড়ার টেবিলে ফেলে এল। যেখানে বসে দুজনে কবিতা মিলিয়েছিল বিয়ের আসরে পড়বে ব'লে। সেখানটায় কলম পড়ে আছে? ছুটল সে-ঘরে। না সেখানেও নেই। আতি পাতি ক'রে সমস্ত ঘর, সমস্ত বাড়ি খুঁজে দেখল অনীতা। সবগুলি ড্রয়ার টেনে বার করল। মল্লিকার সাজান টেবিল তচ্‌নচ্‌ ক'রে ফেলল। কলম কোথাও পাওয়া গেল না। ভয়ে, আতঙ্কে ওর মুখ শুকিয়ে গেছে, দুচোখ ফেটে জল আসছে।

মল্লিকাকে গিয়ে অনীতা এক সময় বলল, কাঁদ কাঁদ হয়ে, 'কলম খুঁজে পাচ্ছি না দিদি।'

মল্লিকা ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে 'যা তোর রাখবার ঢং, কোথায় ফেলেছিস্, কে নিয়ে গেছে তার আমি কি জানি?'

কে জানে কে নিয়ে গেছে। 'কত মানুষ তো এসেছিল, কতজন চলেও গেল। তাদের কজনকেই বা অনীতা চেনে, কাকেই বা সন্দেহ করবে? কিন্তু ছোড়দাকে কেমন ক'রে গিয়ে বলবে এ কথা। তাকে তো এরা জানে না! কি মেজাজ তার, এ ঘরে ও ঘরে দেখা জায়গা-গুলো হাজার বার ক'রে খুঁজে দেখল আবার। চেনা-অচেনা সাম্‌নে কেউ এলেই তাকে একবার জিজ্ঞেস করল অনীতা।

ছুটোছুটির পথে নীরদের চোখে পড়ল দু-একবার। প্রথমটায় একটু অদ্ভুত ঠেকল তার কাছে। একটা কলম হারিয়ে কেউ যে এমন পাগলের মত হয়ে উঠতে পারে এ অভিজ্ঞতা নীরদের এই প্রথম। শুধু কলম কেন কত মেয়ের টুকিটাকি কত সখের সামগ্রী সামান্য একটু চোখ টিপে হাত সাফাই ক'রে ও তুলে নিয়েছে কতবার। অবশ্য সেগুলি খুইয়ে তাদের কি অবস্থা হয় তা দেখার জন্য কে আর সেখানে দাঁড়িয়ে থেকেছে। তা হলেও হয়ত একটু বিরক্তি, সামান্য একটু চোটপাট, দু'চারটে মেয়েলী গালিগালাজ বড় জোর। এই তো ওর ধারণা, কিন্তু আজকের অভিজ্ঞতা অন্য রকম। দু'ঘণ্টার আগের অনীতাকে যেন আর চেনা যায় না। ঘাড়ের উপর বড় খোঁপাটা অবহেলায় ভেঙে পড়েছে, কাঁধ থেকে হাতের উপর এসে আঁচল লুটাচ্ছে। বেশবাসের দিকে নজর নেই। নীরদ আড়চোখে চেয়ে দেখল জলভরা আশ্চর্য কালো দুটি চোখ; কাজল নয়, উৎকণ্ঠায় চোখের নিচে কালি জমে উঠেছে; কপালে, গালে, পাতলা ঠোঁটের নিচে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম রাতের আলোতেও চোখে পড়ছে। কত মেয়েকে কত রূপে দেখেছে নীরদ—দেখেছে আঁট-সাঁট সাজাগোজা অবস্থায়, আবার ঢিলে-ঢালা পোষাকেও দেখেছে কত। কিন্তু এমন ক'রে তো কোনদিন কাউকে চোখে লাগেনি। চোঁখ বাঁকা ক'রেই চিরদিন ওদের সবটুকু দেখা হয়ে গেছে নীরদের। কিন্তু আজ সে দুচোখ ভরে দেখল অনীতাকে। এই মুহূর্তে মনে হ'ল ওর রূপের বুঝি তুলনা হয় না। কেমন যেন নেশা ধরিয়ে দেয়, জামার নিচে কলমটার গায়ে হাত রেখে নীরদ কি যেন ভাবল খানিকক্ষণ।

হয়ত নিচের ঘরে আর একবার খুঁজতে যাচ্ছিল অনীতা। নীরদ ডাকল, 'শুনুন'।

অনীতা ফিরে দাঁড়াল। ব্লাউজের উপরের খোলা সাদা জায়গাটুকু কলমটা এর আগে যেখানে মাথা তুলে ছিল সেখানটা উদ্বেগে ওঠানামা করছে অনীতার, গা ঘেঁসে দাঁড়ালে হয়ত বুকের ধুক্ ধুক্ শব্দটুকুও শোনা যায়। ইসারায় নীরদ ওকে মল্লিকার ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে এল, তারপর চেয়ারের হাতলে ভর দিয়ে একটা অভ্যস্ত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে বলল, 'কলম খুঁজে পাচ্ছেন না, তাই না?'

'না' অবাক হয়ে চোখ তুলে তাকাল অনীতা।

সত্যি ভারি সুন্দর এক জোড়া চোখ, ওর চোখে চোখ রেখে আরেক বার যদি বলতে পারত নীরদ, অপরূপ দুটি চোখ তোমার অনীতা!

নীরদ হেসে বলল, 'সামান্য একটা ম্যাজিক, একটুখানি হাত সাফাই, তাই দেখি ধরতে পারলে না। এবার যদি আরো দামী আরো লোভের জিনিসটির ওপর নজর করি তা হলে?'

বলতে বলতে কলমটা বার ক'রে নীরদ টেবিলের উপর রেখে দিল।

অনীতা কিন্তু জবাব দিল না। নীরদের সর্বাঙ্গে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে চোখের দিকে চেয়ে রইল শুধু, কি বলতে চায় নীরদ? এই ওর ম্যাজিক! এ ম্যাজিকের কথা অনীতার কাছে না হয় চিরদিন গোপনই থেকে যেত। কলম ফিরে নাই বা পেত অনীতা।

আরও কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ ক'রে থাকে। নীরদ বুঝতে পারছে। ভঙ্গিটা অপরিচিত হ'লেও এ চোখের ভাষা বুঝতে ওর দেরি হয় না। কিন্তু মনের মত গুছিয়ে একটা কথা বলতে বড় দেরি হ'য়ে যায় নীরদের। তার আগে অনীতা উঠে দাঁড়ায়। ম্লান একটু হেসে বলে, 'যান, বাইরে যান এবার। কেউ হয়ত এসে পড়বে।'

সেতুবন্ধ

দরজার পর্দাটা একটু তুলে ধরতেই অবাক হয়ে যায় হেমন্ত। সামান্য একটা বাল্‌বের অদল বদলে সমস্ত ঘরের চেহারাটাই যেন বদলে গেছে। শাদা বাল্‌বের বদলে একটা নীল বাল্‌ব শুধু। খাট, পাল্লায় গ্লাস ফিট্ করা লম্বা আলমারী, বেতের চেয়ার তিনটে, নীল বাল্‌বের নরম আলোর নীচে সবই কেমন ছায়া-ছায়া, অস্পষ্ট। এক কোণে টিপয়ের ওপর ঢাকনা ঢাকা রেডিও সেটে বিলম্বিত লয়ে বাম্মাকণ্ঠ। আর সাম্‌নে দাঁড়িয়ে সুপ্রভা, এই শীতের শুরুতেই গায়ে মোটা স্কার্ফ জড়িয়েছে, পায়ে হাল্কা চটি।

এগিয়ে এসে সুপ্রভা অভ্যর্থনা জানাল, হেসে বলল, 'এসো, খুব অবাক লাগছে বুঝি।'

হেমন্ত বলল, 'তা একটু লাগছে। হঠাৎ নীলিমার সখ যে বড়।'

সুপ্রভা জবাব দিল, 'না সখ ঠিক নয়, টেবিল ল্যাম্পের প্লাগটা বিগড়েছে, ওটার ওপর কেরামতি করতে ভয় হ'ল, পাছে মেইনটা বিগড়ে ফেলি।'

ছেলেকে নিয়ে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে হেমন্ত ভাবে শহরতলীতে, এই দমদমেও বালিগঞ্জ মিলিয়ে বসেছে সুপ্রভা। ওটা ওর হাতেরই গুণ, সামান্য একটা বাতির হেরফের ক'রে, খাটের পাশে আলমারী দাঁড় করিয়ে সুপ্রভা ঘরের চেহারা ফিরিয়ে দিতে পারে। এই ঘর তো দুদিন আগেও হেমন্ত একবার দেখে গেছে। পাঁচ বছর পরে অবনী ডাক্তারকে আবার ধরতে পেরেছে হেমন্ত, ধরেছে এই দমদমে,

যশোর রোডের ধারে। কিন্তু আজ ঘর দেখতে নয়, হেমন্ত এসেছে ছেলেকে ডাক্তার দেখাতে, কয়েক বছর ধরেই বড় ছেলে অরুণ টনসিলাইটিসে ভুগছে। এবারেও শীত পড়তে না পড়তেই অরুণের সেই গলা ব্যথা; অবনীর খোঁজ যখন পাওয়া গেল ওকে একবার ছেলের গলাটা দেখিয়ে নিতে দোষ কি? কিন্তু বৌবাজার থেকে কলেজ ষ্ট্রীট শ্যামবাজার ডিঙিয়ে কেবল কি সেই টানেই হেমন্ত ছেলে নিয়ে এতটা রাস্তা এসেছে, নম্বর মিলিয়ে বাসা বার ক'রে খোঁজ করছে অবনীর?

হেমন্ত বলল, 'অবনী কোথায়? নেই বুঝি, অথচ আমাকে টাইম দিয়েছে ঠিক সাতটা। দেখ কাণ্ড।'

সুপ্রভা হেসে বলল, 'এ কাণ্ড যেন তুমি এই প্রথম দেখলে।'

'ফিরবে কখন?'

সুপ্রভা এবারেও একটু হাসল, বলল, 'তা কি আমাকে ব'লে গেছে, না ব'লে যায় কোন দিন?'

তারপর অরুণের দিকে ফিরে তাকিয়ে বলল, 'তুমি বুঝি দাঁড়িয়েই থাকবে। ছেলে তো বড় লাজুক হয়েছে হেমন্ত। আচ্ছা দাঁড়াও—'

সুপ্রভা উঠে গিয়ে পাশের ঘর থেকে মেয়েকে ডেকে নিয়ে এল, সুপ্রভার মেয়ে মঞ্জুলিকা। তের উৎরে চোদ্দয় পা দিয়েছে। মায়ের মতই টানা চোখ নাক, একই ধরনের গড়ন, পায়নি কেবল মায়ের রঙটা। এই আবছা আলোতেও সে তফাৎটা চোখে ধরা পড়ে। দুজনের সঙ্গে মেয়ের আলাপ করিয়ে দিল সুপ্রভা। হেমন্তকে নিয়ে বয়সের হিসেব করল। মঞ্জুর চেয়ে এক বছরের বড় অরুণ, এক ক্লাশ ওপরে পড়ে। অতএব কেউ কাউকে ছাড়িয়ে যেতে পারেনি।

অরুণের আড়ষ্টভাব দেখে সুপ্রভার কেমন একটু মায়া হয়। হেমন্তের দিকে তাকিয়ে সুপ্রভা বলল,

'ছেলেকে বুঝি খুব শাসনে রাখ হেমন্ত। তোমার পাশে বসে বেচারা কেমন ঘেমে উঠেছে দেখ। ওকে বরং তোর ঘরে নিয়ে যা মঞ্জু। উনি এলে তখন ডেকে আনব।'

মঞ্জুর পিছনে পিছনে অরুণ গিয়ে পাশের ঘরে ঢুকল।

চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে হেমন্ত ভাবে বাল্‌ব বদলানোর ব্যাপারটা আসলে কি। সত্যি কি প্লাগের কোন গোলমাল, না ওটা শুধু সুপ্রভার একটা ছল। কিন্তু তার কোন প্রয়োজন ছিল না। প্রয়োজন ছিল না এই নীল আবছা আলোর। বার বছরের সুপ্রভাকে হেমন্ত দেখেনি, কিন্তু সুপ্রভা বাইশে যা ছিল, বত্রিশেও তাই আছে। এতটুকু কোমর ভারি হয়নি, গালে একটা ভাঁজ পড়েনি। না কি এটা হেমন্তেরই চোখের ভুল। দশ বছর আগের প্রথম দেখা সুপ্রভার চেহারা কাজলের মত আজও ওর চোখে লেগে আছে। অবনী একটু আগে বেরিয়ে গেছে, হয়ত কোন জরুরী কাজেই বেরিয়ে যেতে হয়েছে, হেমন্তদের জন্যে অপেক্ষা করতে পারেনি, কিন্তু হেমন্ত আর সুপ্রভাকে এমনি মুখোমুখী বসিয়ে রেখে বিনা কাজেও অবনী অনায়াসে বেরিয়ে যেতে পারে। হেমন্ত তো জানে স্ত্রীকে অবনী কোনদিনই ভালবাসেনি, স্ত্রীকে তার কোনদিনই ভাল লাগেনি। ভালো লাগেনি ব'লেই স্ত্রীর ওপর খবরদারির প্রয়োজন হয়নি হেমন্তের। যখন তখন অবনীর সঙ্গে মিশতে দিয়েছে। কিন্তু সুপ্রভার নিজেরওতো একটা দিক আছে। হেমন্তের আসল জোরটা কোন-খানে? সে জোর কি স্ত্রীর রুচিবোধের? কিন্তু রুচির জোর যে কতটুকু হেমন্তের তা জানতে বাকি নেই। তবু যে হেমন্ত পারেনি,

একেবারে কাছে গিয়েও পিছিয়ে এসেছে তা শুধু নিজের দুর্বলতা ছাড়া কি ? সেই চিরকালের দুর্বলতাকে আজ যদি জয় ক'রে বসে হেমন্ত ?

হঠাৎ সুপ্রভা ব'লে উঠল, 'চা করি, একটু চা খাও।'

হেমন্ত চাপা গলায় বাধা দিয়ে বলল, 'না থাক, চা আমি খেয়ে এসেছি। আর চা করতে গেলেই তো তুমি উঠে যাবে। তার চেয়ে বরং সাম্‌নে বসে থাক। আঃ, কতকাল পরে আবার তোমাকে দেখলাম।'

লজ্জায় চোখ নামাল সুপ্রভা। জানালার ফাঁক দিয়ে শিরশিরে একটু হাওয়া দিল, গলার দিকে স্কার্ফটা আরেকটু টেনে দিয়ে সুপ্রভা বলল, 'এরই মধ্যে কি রকম শীত পড়েছে দেখেছ। এবার কলকাতায় ঠিক দার্জিলিংয়ের শীত নামবে দেখে নিও।'

দার্জিলিং ! হ্যাঁ দার্জিলিংয়ের শীতের কথা হেমন্তের আজও মনে আছে। অবশ্য সব কথা কি আর মনে আছে। এতকাল পরে সব কথা কি আর মনে থাকে। কিন্তু এক একটা কথা, ছোটখাট একেকটা ঘটনা সারাজীবনেও বুঝি ভোলা যায় না। অবনী তখন কেবল ডাক্তারী পাস ক'রে রংপুরে প্রাকটিস শুরু করেছে। আমোদ আহ্লাদ নয়, নজরটা আসলে পয়সার ওপর। তবু হয়ত সুপ্রভার তাগিদেই সাতদিনের প্রোগ্রাম ক'রে দার্জিলিংয়ে বেড়াতে যেতে হ'ল। ভাগ্যগুণে হেমন্তও তখন দার্জিলিংয়ে। পুরনো বন্ধু আর বান্ধবীর সঙ্গে দেখাই যদি হয়ে গেল তখন আর দু'দলে দু' জায়গায় থাকা কেন। হেমন্ত উঠে এলো অবনীর হোটেলে, একেবারে পাশের ঘরে। জলাপাহাড়, বার্চহিল ক'রে তিনদিনে অবনী অতিষ্ঠ, কিন্তু সুপ্রভার সখ মেটেনি, মনে মনে তার

আরেকটি পাহাড় বাকি। টাইগার হিল। টাইগার হিলে 'সান্‌রাইজ' না দেখে সুপ্রভা ফিরবে না।

খাওয়া দাওয়ার পাট চুকিয়ে রাত্রে বিছানায় এসে সুপ্রভা পাড়ল কথাটা, বলল,

'চল একদিন টাইগার হিলটা দেখে আসি। টাইগার হিলের সান্‌রাইজ নাকি সত্যি দেখবার মত।'

অবনী বিরক্ত হয়ে বলল,

'হুঁ, টাইগার হিল না দেখলে বাকি টাকা ক'টা ওড়াবে কি ক'রে? জান, টাইগার হিলে যাওয়ার খরচ কত? আগে থেকে ট্যাক্সি ভাড়া ক'রে রাখতে হবে। কমসে কম পনের-বিশ টাকার ধাক্কা। টাকাটা আসবে কোত্থেকে শুনি?'

বিষয়টা হাল্কা ক'রে দেবার জন্য সুপ্রভা হেসে বলল।

'চিরকাল যার কাছ থেকে আসছে, তার কাছ থেকেই আসবে। এত টাকাই খরচ করতে পারলে আর সামান্য ক'টা টাকার জন্যে এমন একটা জিনিস না দেখে চলে যাব।'

'সামান্য টাকা!' অবনী খেঁকিয়ে উঠল, 'কুড়ি টাকা ওর কাছে সামান্য টাকা হ'ল। কত বড় নবাবনন্দিনী! সাতদিনে আমার প্রায় দু'শো টাকা বেরিয়ে গেল। সামান্য টাকা! দু'শো টাকা এক জায়গায় ক'রে তোমার বাবা দেখেছে কখনও?'

রাগে গা জ্বলে গেল সুপ্রভার। গম্ভীর হয়ে সুপ্রভা বলল,

'না যাও না যাবে, তাই ব'লে তুমি বাপ-মা তুলবে নাকি? যা-তা বলবে নাকি?'

ভেংচি কেটে অবনী বলল, 'না তুলবে না! বাপ-মা তুললে মান যায়। স্কুল মাষ্টারের মেয়ের আবার অত ডাঁট্ কিসের?'

সুপ্রভা চুপ ক'রে রইল। কথা বাড়াল না আর। একজনের সামান্য একটা সখকে দাবিয়ে দেয়ার জন্যে আরেকজন হিসেবী মানুষ যে কতটা হিংস্র হয়ে উঠতে পারে, জিহ্বায় কি পরিমাণ বিষ মেশাতে পারে, সে-রাত্রে দরজায় কান রেখে হেমন্ত তার সাক্ষী হয়ে রইল।

শেষ রাতে অবনীদের ডেকে তুলে হেমন্ত বলল, 'চল, গাড়ি করেছি। টাইগার হিল্‌টা সেরে আসা যাক।'

অবনী ভাবল হেমন্তের মাথায়ও তাহলে ঐ পাগলামি ঢুকেছে। তা ঢুকুক, হেমন্ত ব্যাচিলার মানুষ, বাজে খরচ ওর পোষায়। কিন্তু অবনীর ওরকম বাজে সখ নেই। এই শীতের মধ্যে কম্বলমোড়া হয়ে ছোটো সেই টাইগার হিলে। থুতনি পর্যন্ত লেপ টেনে দিয়ে অবনী জড়ান গলায় বলল,

'ক্ষেপেছ, এই শীতের মধ্যে রাখ তোমার সান্‌রাইজ আর মুন্‌রাইজ, দি সান উইল সি মি ইন মাই বেড ইন দ্য মর্নিং।' অবনী ততক্ষণে মাথা পর্যন্ত লেপ ঢাকা দিয়েছে।

অগত্যা বন্ধুপত্নীকে অনুরোধ জানাতে হ'ল। হেমন্ত বলল, 'তাহলে আপনি চলুন। এ জিনিস একা একা দেখে ভাল লাগে না। অবনী চিরকালের কুঁড়ে, ও যে যাবে না তা জানতাম।' অবনী অবশ্য বাধা দিল না। কারণ সে সঙ্গে না গেলে ভাড়াটা আর ভাগের নয়, শুধু একজনের।

হেমন্তের পাশে বসে মোটরে যেতে যেতে সুপ্রভা একসময় বলে উঠেছিল, 'এই শীতের মধ্যে এতটা রাস্তা মিছামিছি না এলেই হতো হেমন্তবাবু।'

'না, হতো না। তুচ্ছ দুটো ধমকের ভয়ে এমন একটা-জিনিস দেখে না গেলে, শেষে আপশোষ ক'রে মরতেন।'

সুপ্রভা অবাক হয়ে বলল,

'ধমক! আপনি জানলেন কি করে?'

'বাইরে থেকে আমি সব শুনেছি। আপনি রাজি না হলে আমিই জোর ক'রে নিয়ে আসতাম।'

জোর ক'রে! হেমন্তের মুখের দিকে সুপ্রভা চোখ তুলে তাকাল, সত্যি কি হেমন্ত জোর করতে জানে?

গাড়ি থেকে নেমেও খানিকটা হাঁটাপথ। শেষ পর্যন্ত গাড়ি চলে না, পা চালাতে হয়। কিন্তু সেপ্টেম্বরের শুরুতেই বাইরে যে এমন বেয়াড়া শীত পড়বে সে কথা কে ভেবেছিল। কয়েক পা এগিয়েই হাত বাড়িয়ে সুপ্রভা বলল, 'ধরুন, হেমন্তবাবু, ইস্ পা তো অবশ হয়ে গেছে।'

একটা কালো লংকোটে সুপ্রভার প্রায় সমস্ত শরীর ঢাকা, কেবল মুখখানা দেখা যাচ্ছে। মাথায় আধখানা ঘোমটা। আর সোনার চুড়ি দু'গাছা শুধু বাইরে বেরিয়ে আছে। হিমার্ত কোমল মুখখানার দিকে চেয়ে চোখ জুড়িয়ে গেল হেমন্তের। হেমন্ত হেসে বলল,

'এইটুকু শীতেই কাবু হয়ে পড়লেন।'

সুপ্রভা ভুরু বাঁকা ক'রে বলল,

'এইটুকু শীত! আপনার আর গায়ে লাগল না। সত্যি পা দুটো ঠাণ্ডা হিম হয়ে গেছে, আমি আর হাঁটতে পারলে তো! আর হাত দুটো দেখুন তো একবার ধরে।' ডান হাতটা বাড়িয়ে দিল সুপ্রভা।

হাতে ধরে নয়, সুপ্রভাকে পাঁজাকোলেই তুলে নিয়েছিল হেমন্ত, বয়েও নিয়েছিল শেষ পর্যন্ত। কিন্তু একেবারে বুকের কাছে, ঠোঁটের কাছে পেয়েও সেদিন আর কি করতে পারল হেমন্ত?

মাটিতে নেমে অদ্ভুত একটু হেসে সুপ্রভা বলল, 'নাঃ, আপনি কোন কাজের নন হেমন্তবাবু। এইটুকু আনতেই এত জোরে শ্বাস ফেলছেন? ভারি পুরুষ তো।'

সেদিনের সেই জোরে জোরে শ্বাস ফেলা, হেমন্তর শরীরের মৃদু কম্পনের কারণ যে শুধু পরিশ্রমেই নয় তাকি ওরা দুজনেই বুঝতে পারেনি! কিন্তু সব বুঝেও হেমন্ত সেদিন চুপ ক'রে ছিল, জবাব দেয়নি। তারপরেও দু'জনের দেখা হয়েছে কয়েকবার। কখনও রংপুর, কখনও জলপাইগুড়ি। অবনী যত জায়গায় ওর ডাক্তারীর তাঁবু ফেলেছে, সব জায়গায় গিয়ে জুটেছে হেমন্ত। 'আপনি'র খোলস কখন একদিন সরে গিয়ে দু'জনে দু'জনের কাছে তুমি হয়ে উঠেছে। তবু সবটুকু বাধা ঘোচেনি, দুই সমুদ্রের সবটুকু দূরত্ব দূর হয়নি। কিন্তু আজ যদি এই পরিবেশে সুপ্রভার এই ঘরের মধ্যে বসে বাধাটুকু সে ঘুচিয়ে দেয় তা' হলেই বা দোষ কি?

দু'হাতে তালি দিয়ে সোনার চুড়ির মৃদু আওয়াজ তুলে সুপ্রভা মশা মারল একটা। বলল,

'দমদমের এই আরেক জ্বালা হেমন্ত। কিন্তু তুমি সেই থেকে কি ভাবছ বলত?'

হেমন্ত হেসে জবাব দিল, 'ভাবছি না, দেখছি।'

নিচু গলায় সুপ্রভা বলল, 'কি দেখছ!'

হেমন্ত বলল, 'কি দেখছি তা বুঝি তুমি জান না?' তারপর একটু কাল থেমে থেকে বলল, 'দেখছি তোমাকে।'

লজ্জায় চোখ নামিয়ে সুপ্রভা বলল,

'যাও, তোমার যত বাজে কথা। কেবল দেখা আর দেখা। শুধু দেখে দেখেই যেন মন ভরে, সব সাধ মেটে।'

হেমন্ত ফিসফিস ক'রে বলল, 'না, আজ আর তা মেটাব না সুপ্রভা। আজ আমার আরো চাই। আজ আমার সব চাই।'

আলগোছে বেতের চেয়ারটা আরেকটু সাম্নে টেনে আনল হেমন্ত, বসল কাছাকাছি। বিলাতি স্নোর মিষ্টি একটা সৌরভ এতক্ষণে এসে হেমন্তের নাকে লাগছে। সুপ্রভার নিঃশ্বাসের সুরভি কি তার সঙ্গে মিশে নেই?

রেডিওর দুটো প্রোগ্রামের মাঝখানে এক মুহূর্তের বিরতি। সেই অবকাশে সুপ্রভা শুনতে পেলো পাশের ঘরে স্টোভ নিভানোর শব্দ। মঞ্জু চা করছে অরুণের জন্যে। নিঃশব্দে উঠে গিয়ে রেডিওটা বন্ধ ক'রে দিল সুপ্রভা। তারপর দু'জনে কান খাড়া ক'রে রইল। হেমন্তের জন্যে সুপ্রভার চা করতে হয়নি, হেমন্ত চা খায়নি। কিন্তু অরুণ না খেয়ে ছাড়া পাবে না। যা জেদী মেয়ে মঞ্জু। এ ঘর নিঃশব্দ ব'লেই হয়ত ও ঘরের কাপের গায়ে চামচের শব্দটা এতটা জোরে শোনা যাচ্ছে। চা খাওয়া শেষ হ'ল, এবার বিদায়ের পালা। কি জানি কি কথা ওরা বলছিল এতক্ষণ।

'উঠি এবার,' অরুণের গলা শোনা গেল, 'বাবাকে তাড়া না দিলে রাত দশটায়ও ওর যদি খেয়াল হয়। কি যে স্বভাব হয়েছে আজকাল, একবার যদি কথা পেল তো—'

মঞ্জুর হাসিতে অরুণের কথার শেষটুকু ঢাকা পড়ল।

মঞ্জু বলল, মারও সেই দশা, কারো সঙ্গে কথা বলতে বসলে আর কোন দিকে যেন খেয়াল থাকে!

অরুণ হয়ত উঠতে যাচ্ছিল। মঞ্জু বাধা দিয়ে বলল, 'বসুন আরেকটু! এত তাড়া কিসের, এই তো সবে সাড়ে আটটা।'

অরুণ বলল, 'দেখি আপনার বাবা এলেন নাকি।'

অভয় দিয়ে মঞ্জু বলল, 'হ্যাঁ, আপনিও যেমন, একবার বেরোতে পারলে রাত দশটার আগে বাবা কবেই বা ফেরে।'

অরুণ বলল, 'আস্তে আস্তে, কিন্তু ওরা রয়েছেন ওঘরে, কি ভাববেন। আজ যাই, আসব আরেকদিন।'

মঞ্জু বলল, 'আরেকদিন নয়, কোন্‌দিন তাই বলুন। বলুন শনিবার আসছেন। একেবারে সন্ধ্যা ক'রে নয়, বিকেলবেলা। এখন তো আর পরীক্ষার ঝামেলা নেই। হ্যাঁ, একটু সময় হাতে নিয়েই আসবেন।'

অরুণ বলল, 'আচ্ছা, তাই আসব।'

পর্দা ঠেলে দুজনে এসে এ ঘরে দাঁড়াল। হেমন্ত তার আগেই উঠে পড়েছে। সুপ্রভা কিছু বলবে না? বাইরে এগিয়ে দেবে না একটু? কিন্তু সুপ্রভা নিশ্চল হয়ে চেয়ারে বসে আছে। আর নীলচে আলোয় হেমন্ত লক্ষ্য করল ওর মুখের সাম্‌নে দমদমের জ্বালা, পুরো একটা মশার ঝাঁক। কিন্তু সুপ্রভার হাত উঠছে না। মশা মারার দিকে ওর আর মন নেই। ওর ক'টাকেই বা মেরে কমাতে পারে সুপ্রভা?

বান্ধবী

দেখা হ'ল ক্যাম্বেলের ঠিক সাম্‌নে। নমিতার আগেই চোখে পড়েছিল, এবার গীতা এসে সাম্‌নে দাঁড়াল। একেবারে মুখোমুখি। হেসে বলল,—'মরিসনি তা'হলে, বেঁচে আছিস, আর আছিস কলকাতায়ই। অথচ দেখা-সাক্ষাৎ একেবারে বন্ধ। কিন্তু হঠাৎ এখানে কি মনে করে?'

এক গজ ব্লাউজের কাপড় বাছতে বাছতে শিয়ালদহ ছাড়িয়ে এতটা চলে এসেছে নমিতা। কিন্তু ছ' বছর আগের সহপাঠিনীর কাছে সে স্বীকারোক্তি সহজে করা যায় না। চট ক'রে ছোট্ট একটা মিথ্যে কথা বলতে হয়। বলতে হয়, 'বোনঝি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে, দেখতে এসেছিলাম। আর তুই?'

গীতা বলল, 'অফিস ফেরত। বাসে যা ভিড়। ভাবলাম বাহন বদল করি, ট্রামে যাই। অবশ্য লোকসান হয়নি। বাস থেকে নেমেই তোকে পেয়ে গেলাম।'

দু-চার পা এগিয়ে গিয়ে একটা রেষ্টুরেন্টের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে হাতের ব্যাগ দুলিয়ে গীতা বলল, 'কি খাবি?'

নমিতা এতক্ষণ ওর বেশবাসের দিকে চেয়ে দেখছিল, সাজপোশাকে অনেক বদলে গেছে গীতা। ছ' বছর আগের 'ভিক্টোরিয়া'র সে সাদাসিধে মেয়েটিকে আর চেনা যায় না। চাকরির সঙ্গে সঙ্গে সব হয়েছে। ওর পরণে সরু পাড়ওয়ালা ব্যাঙ্গালোর সিল্ক। গায়ে সিল্কের ব্লাউজ। চিকণ কাজ করা শান্তিনিকেতনী

ব্যাগ হাতে। চাকরির সঙ্গে সঙ্গে সব হয়। হয়ত ভাল চাকরি করে। কে জানে কত মাইনে পায় গীতা। একশ, সোয়াশ, না তারও বেশি?

নমিতা কিন্তু রেষ্টুরেণ্টে ঢুকতে রাজি হয় না। বলে, 'না ভাই, বাইরের খাবার একেবারে সহ্য হয় না। একটু কিছু মুখে দিয়েছি কি অমনি অম্বল।'

গীতা বলল, 'ঈস, ভারি বুড়ি হয়েছিস দেখছি।'

'বুড়ি না তো কি। মেঘে মেঘে বেলা কি আর কম হ'ল?'

নমিতা প্রাণ খুলে একটু হাসতে পারে এবার। না, বয়সের তুলনায় চেহারা ওর ভালই আছে। শরীরের বাঁধ ভাল নমিতার। মনে মনে সে-গর্ব যে একটু না আছে তা নয়।

কিন্তু অত সহজে গীতা ওকে রেহাই দিল না, দোকানের খাবার মুখে না রোচে তো গীতার বাসা আছে, এতকাল পরে দেখা যখন হয়েছে তখন এত সহজেই বান্ধবীকে ছেড়ে দেবে না গীতা।

গীতা বলল, 'রেষ্টুরেণ্টে খেতে না চাস্, বাসায় চল্।'

নমিতা আপত্তি করল, 'না ভাই, আজ থাক। বরং আরেক দিন যাব।' প্রথম দিনেই একেবারে বাসায় গিয়ে ওঠা। কেমন একটু বাধ বাধ ঠেকে গীতার। তাছাড়া এমনিতেই অনেকটা দেরি হয়ে গেছে, সেই কখন বেরিয়েছে বাসা থেকে। কিন্তু গীতা ছাড়লে তো! একটা রিক্সা ডেকে নমিতাকে একরকম জোর ক'রেই তাতে টেনে তুলল। রিক্সায় বসে গীতার কথা যেন আর ফুরোতে চায় না। কেবল গল্প আর গল্প। অফিসের কোন্ লোকটা কেমন ক'রে তাকায়, কার ছুঁচোর মত গোঁফ, কোন্ ছেলেটা গরমের দিনেও গায়ে একটা মোটা কোট চড়িয়ে

আসে। সুপারিন্‌টেডেন্টকে কবে একদিন আচ্ছা ক'রে ধমকে দিয়েছিল, সেইসব গল্প। আর এতও জানে গীতা!

কিছুক্ষণ বাদে রিক্সা এসে থামল পার্কসার্কাসের কাছাকাছি একটা তিনতলা ফ্ল্যাট বাড়ির সাম্‌নে। সিঁড়ি ভেঙ্গে দোতলায় উঠল দুজনে। গীতার সাজান-গুছান ঘরের দিকে তাকিয়ে নমিতার মনে হ'ল, ওর হাতেই শুধু শান্তিনিকেতনী ব্যাগ নয়, ঘরখানাকেই শান্তিনিকেতন ক'রে রেখেছে গীতা। দেয়ালে বাছা বাছা কয়েকখানা ছবি; ড্রেসিং টবিলের পাশে বুক-শেলফে রবীন্দ্ররচনাবলীর পুরো সেট। খাটের সাম্‌নে শান্তিনিকেতনে তৈরি মোড়া দুটো। ছোট তাকের উপর টুকিটাকি শৌখীন জিনিস দু'চারটা।

খাটের উপর আলগোছে বসে ঘরের চারিদিকে তাকিয়ে নমিতা প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা গীতা, একা একা এভাবে থাকতে তোর ভাল লাগে?'

'একা কোথায়?'—আঙ্গুল দিয়ে পাশের দরজাটা দেখিয়ে গীতা জবাব দেয়। 'ওটা যদি খুলি তো দেখবি। এক্ষুনি এক পাল এসে হাজির হবে, পাশেরটা দাদাবৌদির ঘর। বৌদির তো এবারেরটি নিয়ে পাঁচ নম্বর চলছে। ও দরজা ভাই খুলতে আমার সাহস হয় না। কেমন যেন গা ঘিন ঘিন করে, বাই দি বাই, তোর ক'টি?'

'আন্দাজ কর্ দেখি।'

'যাঃ, এ আবার কেউ আন্দাজ করতে পারে নাকি?'

'তবু!'

'একটি কি দু'টি।'

'প্লাস আরেকটি।'

'বাই জোভ। তোরা সব কী। সেদিন সুপ্রভা এসেছিল, তারও শুনলাম তিনটি।'

নমিতা বলল, 'আহা, বিয়ে করিসনি তাই, করলে তোরই বা এতদিনে না কোন তিন-চারটে নামত। কিন্তু ও সব বাজে কথা থাক। চাকরি বাকরি দে না একটি জুটিয়ে।'

'তুই করবি চাকরি? কোন দুঃখে?

'ঠাট্টা নয়, সত্যি, আছে নাকি খোঁজে।'

'আছে। আমাদের অফিসেই খালি আছে। মাইনে কিন্তু অ্যালাউন্স নিয়ে একশ'র বেশি পাবিনে। রাজি আছিস্?'

'রাজি। তুই দেখ ভাই।'

ছোট ঘরখানার মধ্যে সব ব্যবস্থাই করা আছে গীতার। ইলেকট্রিক হিটার জ্বেলে চায়ের জল চড়াল। ডিম ভেঙে দুজনের জন্যে অমলেট তৈরী করল।

চা খেতে খেতে নমিতা টের পেল ফুরফুরে একটু হাওয়া এসেছে ঘরের মধ্যে। গীতার ফুলদানিতে রাখা রজনীগন্ধার ছোঁয়া লেগে মিষ্টি একটা গন্ধ।

জানলা দিয়ে বাইরে তাকালে পাশেই খানিকটা খোলা জমি চোখে পড়ে। তার সামনে নতুন রাস্তাটা। রাস্তার ওপর পাশাপাশি কতকগুলি বাড়ি উঠেছে। ভারি সুন্দর জায়গাটা। আর খাটের কি নরম গদিই করেছে গীতা!

একটু বাদে নমিতা বিদায় নিল। যাওয়ার আগে গীতাকে আরও একবার মনে করিয়ে দিল চাকরির কথাটা। ওর ডায়েরিতে নিজের হাতে ঠিকানা লিখে দিল।

বাসে ফিরতে ফিরতে নমিতার মনে হ'ল গীতার ঘরের মিষ্টি গন্ধটুকু এখনও যেন ওর নাকে লেগে রয়েছে। নমিতা মনে মনে উচ্চারণ করল, বেশ আছে গীতা। সাজান-গোছান ফিটফাট একার একখানা ঘর আর পার্মানেন্ট একটা চাকরি। গীতা বেশ আছে।

রাত্রে স্বামীর পাশে শুয়ে কোনরকম ভূমিকা না ক'রে নমিতা বলল, 'শোন, একটা চাকরির খোঁজ পেয়েছি।'

প্রবীরের কাছে এ কথা নতুন নয়। শুনে শুনে কান পচে গেছে। নমিতা মাঝে মাঝে এমনি সব চাকরির খবর নিয়ে আসে। ফিরে শুয়ে সে বলল,—'দেখ, পিঠে আবার কয়েকটা ঘামাচি উঠেছে।'

নমিতা আরেকটু দূরে সরে গিয়ে আগের কথার জের টেনে বলল,—'খবর পেয়েছি মানে প্রায় ঠিক ক'রে এসেছি। গীতা যা বলল তাতে হয়ত সামনের সপ্তাহ থেকেই বেরতে হবে।'

পাশ ফিরে শুয়ে প্রবীর বলল, 'তাই নাকি? কিন্তু তোমার ছেলে? ছেলে রাখবে কে? ছেলে তো এক দিগ্বিজয়ী বীর হয়েছে।'

নমিতা জবাব দিল,—'তুমি আছ, তোমার মা আছেন। তা ছাড়া মানদাকে পাঁচটা টাকা বাড়িয়ে দিলে সে খুশি হয়ে দুপুরের টাল সাম্‌লাবে।'

প্রবীর গম্ভীর গলায় বলল, 'বেশ।'

বেশ নয়তো কি? সন্তানের উপর একটুকু দরদ নেই নমিতার। সন্তান না শত্রু। ওর সব সুখের কাঁটা এই শেষেরটা। এই বাবুল। কার ভাল লাগে এই ঘড়ির কাঁটার সংসার। রাঁধা বাড়া খাওয়া। ইচ্ছেমত একদিন একটু বেরনো যাবে না। কেবল

হিসেব আর হিসেব। বাজারের হিসেব, ধোপার হিসেব, কবে একটা পয়সা বাজে খরচ হ'ল তার হিসেব। প্রবীরের হিসেব করা পয়সার হিসেব রেখে রেখেই কি নমিতা বুড়ি হয়ে যাবে? ওর বুঝি সাধ-আহ্লাদ কিছু থাকতে নেই? আর প্রবীরেরই বা তাতে বাধে কোথায়? সকল কুল রেখে, সবদিক বজায় রেখে বাড়তি দুটো পয়সা যদি ঘরে আসে তাতে লোকসান কি? কিন্তু প্রবীরকে চটিয়ে দিয়ে লাভ নেই। বরং ওকে রাজি করাতে পারলে আর কোন বাধা থাকবে না। প্রবীরের পিঠের কাছে সরে এসে আপোষ করল নমিতা। ঘামাচি মেরে দিয়ে মত আদায় করল প্রবীরের।

আশ্চর্য! ঠিকানা দিয়ে এসেছিল ব'লেই গীতা যে এত তাড়াতাড়ি সেই ঠিকানা ধরে নিজে এসে হাজির হবে একথা নমিতা ভাবতে পারেনি। কিন্তু এসেই যখন পড়েছে তখন ভদ্রতা না ক'রে পারা যায় না। নমিতার ঘর তো আর গীতার ঘরের মত নয়। বার ভূতের সংসার। তিন ছেলেই তো যেন তিন মূর্তি। ওদের জ্বালায় কিছু যদি গোছগাছ ক'রে রাখার উপায় থাকে। তবু গীতাকে বসিয়ে রেখে দ্রুত হাতে ঘরখানাকে ভদ্র ক'রে তুলতে চায় নমিতা। কিন্তু গীতা বসে থাকলে তো। পরের বাড়ি নয়, অফিস সেরে আজও যেন ও নিজের ঘরেই ফিরে এসেছে। এটা ধরে টান দেয়, ওটা নেড়ে-চেড়ে দেখে। 'ভিক্টোরিয়া'র ছাত্রী পুরান গীতাকে আবার ওর মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে। বাবুল কাছেই কোথাও খেলছিল হয়ত, নতুন মানুষের গন্ধ পেয়ে থপ থপ ক'রে পা ফেলে এসে সামনে দাঁড়াল।

নমিতা আশা করেছিল গীতা বুঝি ছেলেকে একটু আদর করবে। কিন্তু বাবুল কাছে যেতেই গীতা ভারী বিব্রত বোধ করল। শাড়ি

সাম্‌লে তিন হাত সরে বসল। তারপর নমিতার দিকে তাকিয়ে হেসে বলল,—

'রাগ করিসনে ভাই। শাড়িটা কাল কেবল ভেঙেছি, আর জানিসই তো, ছেলেমেয়ে আদর করা আমার আসে না।'

মুখে একটু হাসি টানার চেষ্টা ক'রে নমিতা বলে, 'না না, রাগ করার কি আছে, তারপর আমার চাকরির কতদূর কি করলি?'

গীতা জবাব দেয়, 'খুব যে গরজ দেখছি। চাকরি বুঝি চাইলেই পাওয়া যায়। চাকরির জন্য ঘুষ দিতে হয় জানিস।'

'আমি কি দেব না বলেছি?' নমিতা হেসেই বলে কথাগুলি। কিন্তু সে হাসির যে রং নেই গীতার তা নজর এড়ায় না। চাকরির ব্যাপারটা আর এগোল কিনা নমিতার হয়ত সেই ভয়।

গম্ভীর হয়ে গীতা বলল, 'ভয় নেই, চাকরি তো তোর বার আনা ঠিক। সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট কথা দিয়েছে। বোধ হয় আসছে হপ্তায় 'কল' করবে। কিন্তু চাকরি পেয়ে কি খাওয়াবি বল?'

নমিতা বলে, 'গরীবের যা জোটে, ডাল, ভাত, মাছ···' বাকিটুকু গীতাই শেষ করে, 'তোর ঐ রান্নাঘরে চাটাই পেতে বসে, তাই না?' 'ছোঃ, তার চেয়ে তুই বরং চৌরঙ্গি গ্রিলের দুটো ফাউল কাটলেট খাওয়াস। বেশ লাগবে। আমার তো আর তোর মত অম্বল হয় না।'

নমিতা হেসে জবাব দেয়, 'আচ্ছা তুই যা চাস, তাই খাওয়াব।'

নমিতার ভাবী চাকরির 'কল' আসার আগে, সাত দিনের মধ্যে গীতা আরও দু'দিন এসেছে এবাড়িতে, এখানে এলে ওর দেখা যেন শেষ হয় না, কথা যেন ফুরোতে চায় না। অন্যের বাড়িতে এলে ও

একেবারে অন্য মানুষ। দুদিনে নমিতার সব খবর জেনে ফেলেছে গীতা। সব ঘরে ঢুকেছে। নমিতার সংসারের কোন কিছু ওর আর অজানা নেই। তবু কেন আজ আবার এল গীতা। আবার কেন কড়া নড়ে?

বিরক্ত হয়ে দোর খুলে নমিতা দেখল, গীতা নয়, সুপ্রভা। নমিতা অবাক হয়। 'তুই? খবর নেই বার্তা নেই। হঠাৎ একেবারে ভবানীপুর থেকে পাইকপাড়া, কি ব্যাপার?'

কিন্তু সুপ্রভার দাঁড়াবার সময় নেই। ও এসেছে গীতার খোঁজে খোঁজে। পার্কসার্কাসের বাসায় গিয়ে খবর পেয়েছে আফিস থেকে ফিরতে আজও দেরি হবে গীতার। ফেরার পথে পাইকপাড়ায় কোন এক বান্ধবীর বাসা হয়ে ফিরবে। পাইকপাড়ায় ওদের বান্ধবী বলতে তো এক নমিতা। জানা শোনা আর কেউ থাকে না এদিকে। তাই সোজা নমিতার বাসায় চলে এসেছে।

নমিতা জানতে চাইল, দরকারটা কী।

সুপ্রভা বলল, 'আর বলিস কেন। খোকার এ্যালবামটা কাকে দেখাবে ব'লে নিয়ে এসেছে আজ পনের দিন। আর ফেরত দেবার নাম নেই, কাল খোকার জন্মদিন। বাড়িতে আমি কি ব'লে বোঝাব বল ত?'

নমিতা হেসে বলল, 'কিন্তু ছেলেপুলে তো গীতার দু'চোখের বিষ। আর তোর ছেলের ছবি বুঝি ওর চোখের মণি হয়ে উঠেছে।'

সুপ্রভা মুখ বাঁকিয়ে বলল, 'বিষ না আরো কিছু। ঢং, ও সব ঢং, লোক দেখান ঢং আর আমার বুঝতে বাকি নেই।'

নমিতা বলল, 'তুই ওর উপর ভারী চটে গেছিস দেখছি। আমার কিন্তু ও সত্যি একটা উপকার করছে।'

'কি উপকার ?'

'চাকরি ঠিক ক'রে দেবে বলেছে, বলেছে কি প্রায় ঠিক ক'রে ফেলেছে।'

ম্লান হেসে সুপ্রভা বলল, 'হুঁ দেবে। তিন মাস ঘুরিয়ে যেমন আমাকে জুটিয়ে দিয়েছে, তোকেও তেমনি দেবে। আশায় থাক।'

নমিতা এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইল। গীতার তাহলে সবটুকুই ছল, সবটুকুই ছলনা। চাকরির সম্বন্ধে ও যা যা বলেছে সব মিছে কথা। তাই যদি, তবে মিছামিছি আর আসা কেন ? কেন আসে গীতা ?

নমিতা বলল, 'তাহলে বারবার ও আসে কেন।'

'কেন আসে বুঝিস না ?' নিচু গলায় সুপ্রভা বলে, 'শুধু কি এ্যালবাম ? এ্যালবামের সাথে সাথে আমার কতকগুলি পুরোন চিঠি পর্যন্ত হাওয়া। বিয়ের ঠিক পর পর লেখা ওঁর কয়েকখানা চিঠি। জানিসই তো তার মধ্যে বাজে বাজে কি সব কথা আছে। তোর খোকার অ্যালবাম নেই, কিন্তু খোকার বাবাটিকে ভাই সাবধান।' সুপ্রভা মিটিমিটি হাসতে থাকে।

নমিতা আস্তে আস্তে বলল, 'বিয়ে করলেই পারে, বিয়ে করে না কেন ?'

সুপ্রভা বলল, 'হ্যাঁ, তুইও যেমন, ওসব মেয়ে আবার কোনদিন বিয়ে করতে পারে নাকি। বিয়ে করার ঝামেলা দেখে না, তোর আমার বিয়ের সুখ দেখে না ? ওরা চায় শুধু ছুঁয়ে ছুঁয়ে বেড়াতে। খবরদার, আর কোনদিন ঢুকতে দিবিনে বাড়িতে। আজ উঠি ভাই, এর পর ফিরতে রাত হয়ে যাবে। কাল সকালে গিয়ে বরং গীতাকে ধরব।' সুপ্রভা আর দেরি করল না।

নমিতা সব শুনল, সব বুঝল। সুপ্রভা চলে গেলে, উঠে এসে দরজা বন্ধ করল। কিন্তু একটু বাদে ফের যখন কড়া নড়ে উঠবে, গীতা এসে পড়বে, তখন কি করবে নমিতা? সব জেনেশুনেও কি গীতাকে দরজা না খুলে দিয়ে থাকতে পারবে?

ভয়

রোগ নয়, চেম্বারের মধ্যে যেন এক ফৌজদারী মামলার আসামী ধরে ফেলেছে সুবোধ ডাক্তার। সুবর্ণর পিঠে আঙুল পেতে টোকা মেরে মেরে ভাল ক'রে পরীক্ষা করল, তারপর কানের স্টেথস্কোপ গলায় নামিয়ে গম্ভীরমুখে ডাক্তার বলল, "বুকের বাঁ-সাইডটায় দোষ হয়েছে। অবশ্য ভয় পাবার কিছু নেই। ডান দিকটা ভালই আছে। ছু' তিন কোর্স ইন্জেকশন দিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু তার আগে ফটো চাই একটা, দেখতে হবে কতটা ইনজিওরড্ হয়েছে। ঠিকানা লিখে দিচ্ছি, এখানে গেলে ছু' দিনেই ফটো পেয়ে যাবে। আর যেন দেরি করো না। বুঝলে অনন্ত। রোগের সঙ্গে তো আপোষ চলে না।"

প্যাডের কাগজ টেনে ডাক্তার ঠিকানা লিখল।

কেবিনের মধ্যে একবার বুঝি গা-কাঁটা দেয় সুবর্ণর। আর কিছু নয়। টি.বি.-ই তা হলে! যক্ষ্মা! যক্ষ্মা হয়েছে সুবর্ণর!

অনন্ত কিন্তু অত সহজে ঘাবড়ায় না। শক্ত মজবুত চেহারার মানুষ, নিজের ওজনে বোধ হয় অন্যের শরীরের ওজন বুঝতে চায়। সুবোধ ডাক্তারকে একটু জেরা ক'রে দেখতে চায় অনন্ত। করবেই তো। একটু বাদেই করকরে চারটে টাকা ওর ভিজিট দিতে হবে।

অনন্ত বলল, "কিন্তু ডাক্তারবাবু, তেমন কিছু হলে তার আগে জ্বর হবে না?"

"হয়, তবে সব ক্ষেত্রে পেসেণ্ট সেটা টের পায় না।"

"বুকে-পিঠে ব্যথা-বেদনা একটু ?"

সুবোধ ডাক্তার বিশারদের হাসি হেসে বলে, "কারো কারো বেলায় সেটা আসে পরে। ও-সব তুমি বুঝবে না অনন্ত। তোমাকে যা করতে বলি তাই কর।"

বেকুবের কথায় এর বেশী কি আর জবাব দেবে সুবোধ ডাক্তার। ডাক্তারের ভিজিট মিটিয়ে দিয়ে একটা রিক্‌সা ডেকে বৌকে নিয়ে অনন্ত তাতে উঠে বসল। আসার সময় এ রাস্তাটুকু দুজনে হেঁটেই এসেছে, কিন্তু এখন যে ক' গণ্ডা পয়সা বাজে খরচ ক'রে রিক্সায় ফেরা এতো সুবর্ণর অসুখের খাতিরে নয়, অনন্তর অফিসের খাতিরে। অফিসে দেরি হয়ে যাবে সেই ভয়ে। বৌর অসুখে দেরি ক'রে অফিসে যাবে তেমন মানুষ নাকি অনন্ত, সুবর্ণর চিনতে আর বাকি নেই। তবু যদি অফিসের মত অফিস হ'ত। অফিস মানে তো লোহা-লক্কড়ের দোকানে খাতা লেখার চাকরি। আশি টাকার গোমস্তাগিরি।

আজ চার বছর ওদের বিয়ে হয়েছে, কিন্তু সুবর্ণর জন্যে, ওর অসুখ-বিসুখের জন্যে কোন্ কাজটা অনন্তর ঠেকে রয়েছে? এমন মানুষেরই হাতে পড়েছে সুবর্ণ। যেমন শক্ত পেটান চেহারা—মানুষটার ভিতরটাও তেমনি শুকনো কাঠ। একদিন একটু সাধ না, আহ্লাদ না, শখ ক'রে কোথাও একটু বেড়াতে যাওয়া পর্যন্ত না। মেয়েছেলে নিয়ে হ্যাং হ্যাং ক'রে ঘুরে বেড়াতে নাকি বাবুর লজ্জা করে। আর এখন তো সব সাধ-আহ্লাদেরই শেষ হ'ল, সুবর্ণকে এখন শয্যা-ধরা হয়ে ঘরের মধ্যে পড়ে থাকতে হবে। সেই শয্যা বিছাবার জায়গাই-বা কই? উল্টোডাঙার বস্তিতে দু'খানামাত্র ঘর। সে কি ঘর নাকি? পায়রার খোপ। তার একখানা শাশুড়ী-দেওরের দখলে। আরেকখানার মধ্যে ছেলেমেয়ে নিয়ে

নিজেরা চারজন, তার উপর অনন্ত এনে দুই ভাগ্নেকে জায়গা দিয়েছে। বোঝার উপর শাকের আটি। মামার বাসায় থেকে ভাগ্নেরা স্কুলে পড়ে মানুষ হবে। মানুষ না ছাই হবে। আসলে জামাইর চাকরি নেই। পেট চলে না। তাই ছেলে দুটোকে পার করা। সুবর্ণ জানে সবই কিন্তু মুখ ফুটে বলুক দেখি সে কথা। না, অনন্তর বোনের গুষ্টি নিয়ে ও কোনদিন আর কিছু বলবে না। সে আক্কেল সুবর্ণর বিয়ের দুদিন পরেই হয়ে গেছে. সে কথা কি ভুলে গেছে সুবর্ণ? ক'দিন পরে বিয়ের ভিড় ভাঙল কিন্তু ননদ বাসা থেকে নড়তে চায় না। অনন্তকে আড়ালে ডেকে এনে সুবর্ণ শুধু বলেছিল, "ঠাকুরঝি বুঝি থাকবে কিছুদিন?" কথা তো এই। কিন্তু তা শুনে অনন্তর সে কি হাসি। হাসতে হাসতে মাকে ডেকে বলল, "কেষ্টপুরের দাশেদের মেয়ের কথা শুনেছ মা? জিজ্ঞেস করছে বড়দি কবে নামবে বাড়ি থেকে, ঘর কবে খালি হবে। শুনলে কথা? তোমার এই বউ আবার পাঁচজন নিয়ে ঘর করবে? তবেই হয়েছে।"

কি বেহায়া মানুষ গো! একটু যদি আগল থাকে মুখের। আর এত জোরেও হাসতে পারে মানুষ। অনন্তর সে হাসি যেন আজও সুবর্ণর কানে লেগে রয়েছে। ঘরতো ফাঁকা হয়নি। ননদ গিয়ে দুই ছেলেকে সে ঘরে ভরে দিয়েছে। আর সেই ভরা ঘরে থেকে থেকে সুবর্ণর মন ফাঁকা হয়েছে, দেহ শেষ হয়ে এসেছে। তাতেই বা অনন্তর কি? সুবর্ণ মরে গেলেই বা অনন্তর কি এসে যায়? সুবর্ণ মুখ ফিরাল। কতকাল পরে আজ একটু রিক্সায় উঠেছে। দু' পাশের সাজান দোকানপাট দেখতে বেশ লাগে সুবর্ণর। বিড়ির দোকানে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে একটা লোক বিড়ি বাঁধছে। রিক্সার গা ছুঁয়ে একটা মোটর গাড়ি ছুটে বেরিয়ে গেল।

রাস্তার মোড়ে একটা ট্রাম এসে থামতেই এক গাদা লোক ট্রামে ওঠার জন্যে ঠেলাঠেলি লাগিয়ে দিয়েছে। সুবর্ণর মনে হ'ল ও যদি ঐ ভিড়ের মধ্যে গিয়ে মিশতে পারত!

ধীরেসুস্থে একটা বিড়ি ধরিয়ে অনন্ত বলল,

'খুব বুঝি ভয় পেয়ে গেছ?'

সুবর্ণ মুখ না ফিরিয়েই জবাব দিল,

'না, ভয় পাব কেন? আমার আবার ভয় কি? ওকি ভয় পাওয়ার রোগ যে ভয় পাব!'

অনন্ত বলল,

'কোলকাতার ডাক্তারদের কি আর আমার চিনতে বাকি আছে। এটা হ'ল ওদের ব্যবসা। বোলচাল না দিলে কি ব্যবসা চলে! সেটা কি আর বুঝি না?'

'ওমা, তুমি বুঝবে না! তোমার চেয়ে কি আর ডাক্তাররা বেশি বোঝে?' বাঁকা কথার ছুঁচ ফোঁটায় সুবর্ণ। রাগে গুম হয়ে রইল অনন্ত। নেহাৎই রোগে পড়েছে, নইলে এই রাস্তার মধ্যেই হয়ত বৌকে অনন্ত দু'চার ঘা লাগিয়ে দিত।

অনন্ত কিন্তু রিক্সা নিয়ে নিজের বাড়ির রাস্তায় গেল না। ঘুরিয়ে নিয়ে গেল সেই ফটো তোলার ডাক্তারখানায়। সমস্ত রাস্তা গজর গজর করল। কিন্তু আট টাকা খরচ ক'রে ফটোর ব্যবস্থাটাও ক'রে এল সেইসাথে। তা করবে না। লোকের কাছে নইলে ভাল মানুষ সাজবে কি ক'রে। বলবে কি করে, ডাক্তার হুকুম করার সঙ্গে সঙ্গে ফটো তুলিয়ে এনেছে। বৌর অসুখে অনন্ত কর্তব্যে ত্রুটি করেনি!

বাড়ি ফিরে মাকে শুধু কথাটা জানাল অনন্ত। পাছে জানাজানি হয়, ভাড়াটে বাড়ি। তাহলে বাড়িই ছাড়তে হবে হয়ত।

সব শুনে সৌদামিনী কিছুক্ষণ গুম হয়ে রইল। তারপর বলল, "তা আর হবে না। রোজ দু'বার ক'রে গা ধোওয়া যাবে কোথায়। অসুখ বাঁধান তো নয়, এ হ'ল আমাদের সকলকে আক্কেল দেওয়া। এখন ঢাল টাকা। বৌ তো ভাল হোক, আর সবাই না খেয়ে মরলেই বা কি।"

সুবর্ণর আর সহ্য হ'ল না। শাশুড়ীর মুখে মুখে কোনদিন জবাব দেয়নি সুবর্ণ, দিতে পারেনি অনন্তের ভয়ে। আজ আর কাকে ভয় করবে? যে রোগ হয়েছে তাতে এখন ওর জন্যেই কতজন ভয়ে মরবে।

সুবর্ণ বলল, "আমার গা ধোওয়া, চুল বাঁধাই তো সকলের চোখে পড়ে। কিন্তু দুবেলা যে গুষ্টির হাঁড়ি ঠেলছি, সেটা কারও চোখে পড়ে না। তখন বুঝি সব চোখ বুজে যায়। মেয়ের তো সাজতে গুজতেই দিন যায়। আর মা'র আছে শুধু গলাখানা।"

ঘরের মধ্যে ভবানী ফোঁস ক'রে উঠল, "তোমাদের শাশুড়ী-বৌ'র ঝগড়ার মধ্যে আবার আমাকে টানছ কেন বৌদি? পাঁচজনকে জড়িয়ে না নিলে বুঝি ঝগড়া ক'রে সুখ মেটে না।"

ঝাঁঝাল গলায় সুবর্ণ জবাব দিল,

"মেটেই তো না। তোমার মা যখন ঝগড়া বাঁধায় তখন তাকে কিছু বলতে পার না। সেই তো ঝগড়ার মূল। ঝগড়াটে হিংসুটি কোথাকার।"

সৌদামিনী এগিয়ে এল, বলল, "শুনলি কথা অনন্ত। বৌর কথা শুনলি।"

ভবানী ফোঁড়ন কেটে বলল,

"শুনেই বা কি করবে। মহারাণীর কথার ওপর একটা কথা ব'লে দেখুক দেখি। রোগ বাঁধিয়েছেন না যেন মাথা কিনে বসেছেন।"

অনন্ত ধমক দিয়ে উঠল,

"তুই চুপ কর ভবানী। রোগা মানুষ, না হয় একটা কথা ব'লেই ফেলেছে।"

অনন্তর দরদ দেখে সুবর্ণর গা জ্বলে যায়। সুবর্ণ যেন বোঝে না কিছু। সবাইকে বুঝিয়ে সুজিয়ে অফিসে যাওয়ার তাড়ায়ই অনন্তর এই সালিশি। কিন্তু অনন্তকে আজ আর কিছুতেই অফিসে যেতে দেবে না সুবর্ণ।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে সুবর্ণ তাকে নিজের ঘরে ডেকে এনে বলে, "শোন, আজ তোমার অফিসে যাওয়া হবে না।"

বিরক্তিতে অনন্ত খেঁকিয়ে ওঠে, "না, তা হবে কেন ? বাড়ি বসে তোমাদের ঝগড়া শুনলেই পেট ভরবে, রোগের চিকিৎসা হবে।"

এমন মানুষকে আর দু'বার ব'লে লাভ কি ? সুবর্ণ চুপ ক'রে থাকে।

সমস্ত দিনই সুবর্ণ চুপ ক'রে থাকে। অনন্ত বেরিয়ে গেলে মা, মেয়ে সকাল বেলার ঝগড়ার জের টেনে সমস্ত দিন বক্ বক্ করে। সুবর্ণ জবাব দেয় না। জবাব দেবেই বা কার জোরে। যে মানুষের জোর সবাই করে, সেই অনন্তই ওর নিজের নয়। না, সুবর্ণর কেউ নেই। সন্ধ্যার পরে কেমন যেন ভয় ভয় করতে থাকে সুবর্ণর। ভারি একা একা মনে হয়। সৌদামিনী মেয়েকে নিয়ে ফিস্ ফিস্ ক'রে যেন কি আলোচনা

করে। কাল থেকে স্বর্ণর বিছানা-পাটি, থালা-গেলাস সব আলাদা ক'রে দিতে হবে হয়ত সেই সব আলোচনা। এর পর খোঁজ-খবর চলবে কোথায় ওকে সরান যায়। কোথায় যাবে স্বর্ণ? ছেলে ছু'টোই বা থাকবে কোথায়? একবার ভাবল এই বাসায়ই তো থাকতে পারে সকলের ছোঁয়া বাঁচিয়ে আলাদা হয়ে। কিন্তু অনন্ত কি তা রাখবে। অসুখ-বিসুখের ব্যাপারে যা খুঁতখুঁতি ওর, তা অনন্ত কিছুতেই রাখবে না। পূবদিকের খোলা জানালার দিকে একবার তাকাল স্বর্ণ। বাড়ির এদিকটা অনেকটা গাঁয়ের বাড়ির মত। জানালা খুললেই একটা পুকুর চোখে পড়ে। মজা পুকুর। তার ওপারে আবার একসার বাড়ি। ঘরের মধ্যে মানুষজনের নড়াচড়া। স্বর্ণ চুপ ক'রে সেদিকে তাকিয়ে থাকে। হঠাৎ ওর এক সময় মনে হয়—কেমন যেন জ্বর জ্বর লাগছে না? গায়ে হাত দিয়ে নিজেই একবার পরীক্ষা করল। রাত্রে তাহলে আর ভাত খেয়ে কাজ নেই। ঘরের মধ্যে লম্বা বিছানা পড়েছে। স্বর্ণর পাশে ওর ছুই ছেলে-মেয়ে। ভাগ্নেরা আগে শুতো অনন্তর ডানদিকে। কিন্তু কিছুদিন থেকে অনন্ত সে ব্যবস্থা পালটে দিয়েছে। ডাইনে-বাঁয়ে ছেলেপুলে নিয়ে শুলে ঘুমান যায় না। আর কাজকর্মের পর রাত্রে একটু ভাল ঘুম হওয়া চাই অনন্তর, নইলে শরীর টেঁকে না। মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। অনন্ত নতুন ব্যবস্থা করেছে, একেবারে কোণে সরে গেছে। আর দূরেই বা কি, কাছেই বা কি। যা ঘুম অনন্তর। একবার বিছানায় গা দিলে সারা রাত্রে ঠেলেও জাগান যায় না।

স্বর্ণ ঘুমিয়ে পড়েছিল। অনন্ত কখন ফিরেছে, খেয়ে-দেয়ে কখন শুতে এসেছে কিছুই টের পায়নি; টের পেল ওর গায়ে হাত

লাগতে। হঠাৎ ঘুম ভাঙতে সুবর্ণ বুঝল চার শিশুর দেয়াল ডিঙিয়ে আর ওর একেবারে গা ঘেঁষে এসে শুয়েছে অনন্ত। ওর নিঃশ্বাস এসে সুবর্ণর গায়ে লাগছে। হঠাৎ যেন ধরা পড়ে গেছে অনন্ত। এতক্ষণ কী পরীক্ষা করছিল সে?

আস্তে আস্তে অনন্ত জিজ্ঞাসা করল, "আচ্ছা, ঠিক ক'রে বলত বৌ, রাত্রে তোমার ঘাম হয় কিনা? আমার যেন কেমন সন্দেহ লাগছে। জ্বর নেই জ্বারি নেই, ব'লে দিলেই হ'ল টি.বি. হয়েছে," তারপর গায়ে হাত দিয়ে দেখল "আজ কিন্তু তোমার গা একেবারে ঠাণ্ডা বরফ।"

অন্ধকারেও সুবর্ণ একটু মুখ মুচকে হাসল। দিনের বেলার সেই হম্বি-তম্বি এখন কোথায় অনন্তর? কোথায় সেই দিনের বেলার গলার জোর? সেও তা হলে সুবর্ণর মতই ভয়ে মরছে। কিন্তু একেবারে মুখের কাছে মুখ নিয়ে এসেছে অনন্ত। ওর নিঃশ্বাসের মত সুবর্ণর নিঃশ্বাসও তো গিয়ে অনন্তর গায়ে লাগছে।

আস্তে একটু ঠেলা দিয়ে সুবর্ণ বলল, "সরো তুমি, সরে শোও। জান না এ রোগের নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে বিষ।"

অনন্ত বলল, "তা হোক, ওতে আমার কিচ্ছু হবে না। তুমি বল দেখি শ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে বুকে-পিঠে ব্যথা লাগে কিনা?"

সুবর্ণ কি বলবে। অত কি বোঝা যায় নাকি?

স্বামীর বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে সুবর্ণ বলে, "কি জানি ছাই, বুঝি না কিছু।"

অনন্ত বলল, "আর টি.বি. হয়ে থাকে তো হয়েছে, তাতেই বা ভয় কি? টি.বি. হলেই কি আর মানুষ মরে যায়? আজকাল আর তা মরে না। কত ভাল ভাল ওষুধ বেরিয়েছে। ডাক্তাররা একচোট

বুঝে দেখতে পারে। আমিই কি একেবারে না দেখে ছেড়ে দেব। টাকার জন্যে ভেব না বৌ। ব্যবস্থা একটা হবেই।"

সুবর্ণ ওকে আস্তে একটু ঠেলা দিয়ে বলল, "কিন্তু তুমি সরে শোও।" অনন্ত সরল না।

দু'দিন বাদেই এক্স-রে রিপোর্ট পাওয়া গেল। সুবোধ ডাক্তারের হিসেবটা আগাগোড়াই ভুল, আসলে কিছুই হয়নি সুবর্ণর।

চড়া মেজাজ নিয়ে ঘরে ঢুকল অনন্ত। রাগ ক'রে সুবর্ণর কোলের উপর ফটোটা ছুঁড়ে দিয়ে বলল, "আটটা টাকা দণ্ড যাবার ছিল—তাই গেল। টি.বি. না আরও কিছু। কলকাতার ডাক্তারদের চাল কি আর আমার জানতে বাকি আছে? বলবে, তা'হলে ফটো তোলাতে গেলে কেন। যাওয়া তো কেবল তোমার জন্যে, তোমার মন খুঁতখুঁত করবে সেইজন্যে।"

সুবর্ণ হাসি চেপে অভিমানের ভান ক'রে বলল, "আমার জন্যে? আমার জন্যে কত তোমার ঘুম নেই।"

অনন্ত বেরিয়ে গেলে, সুবর্ণ চোখের সাম্‌নে ফটোটা তুলে ধরল। ভারি তো ফটো, সাদা সাদা অস্পষ্ট কয়েকটা ছাপ। এইগুলি বুঝি পাঁজরের হাড়। বাকিটা সব কাল। সঙ্গে ইংরেজী ছাপান কাগজে কি যেন সব লেখা আছে। লেখা আছে নিশ্চয়ই 'বুকে কোন দোষ নেই সুবর্ণর।' দোষ থাকলেই কি আর ভয়ে মরত সুবর্ণ? না, তা'হলেও সুবর্ণর আর ভয় করত না।

আবার একটা সিগারেট ধরাতে হয়। ঠিক এক জায়গায় দাঁড়িয়ে দশ মিনিটে ছুটো সিগারেট শেষ করেছে হিমাংশু। এটা তৃতীয়টা। অবশ্য হিসেবটা খরচের দিক থেকে নয়, দিল্লীর সেক্রেটারিয়েটে মোটা মাইনের চাকুরে হিমাংশু। পনের দিনের ছুটিতে কলকাতায় বেড়াতে এসে পঞ্চাশ টাকার সিগারেট উড়িয়ে গেলেও সেটা ওর জমা-খরচের খাতায় উঠবে না। হিসেবটা অন্যদিক থেকে। আশ্চর্য, এমন একটা সদর রাস্তায় দাঁড়িয়েও দশ মিনিটের মধ্যে একটা ট্যাক্সি পাওয়া গেল না। অসহ্য গরমে মেজাজ খারাপ হবার যো হয়েছে। এ সময় গরম দিল্লীতেও—কিন্তু কলকাতার মত নয়। দিল্লীতে শুধু গরম। এখানে গরমের সঙ্গে ঘাম, ঘাড়ের কাছে কলারের নীচটা ঘামে ভিজে উঠেছে, সাড়ে তিন টাকার মিহি সামারকুল গায়ে ঠেকছে মোটা চটের মত। কপালে, কানের পিঠে একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি। সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলার মুহূর্তে হিমাংশুর নজরে পড়ল একটা 'আটের বি' এসে ষ্টপেজে দাঁড়িয়েছে। আর—আর দ্রুত হাতে হ্যাণ্ডেল ধরে যে মেয়ে ভিড় এড়িয়ে বাসে গিয়ে উঠল সে মেয়ে হিমাংশুর চেনা।

হাত বাড়িয়ে হ্যাণ্ডেল ধরে বাসে উঠে যাওয়ার ভঙ্গিটুকুর মধ্যে একটা মানুষের কতটুকুই বা চেখে পড়ে। বড় জোর মুখের একটা পাশ, বাঁ হাতের খালি কব্জিটা আর আঁচলের ফাঁক দিয়ে কোমরের খাঁজটুকু, হাত বাড়ানর সঙ্গে সঙ্গে যেখানটায় ব্লাউজের

কাপড়ে টান পড়ছে। তবু এটুকু থেকেই হিমাংশুর চিনতে দেরী হয় না এ আর কেউ নয়, শ্রীলেখা। দ্বিধায় পড়ে হিমাংশু। একটু ভাবতে হয়। কতক্ষণ আর ট্যাক্সির আশায় দাঁড়িয়ে থাকবে। সরকারী বাসের ভিড়ের দুর্ভোগটুকু স্বীকার ক'রে নিলে সেওতো গিয়ে আটের বি-তে উঠতে পারে। না, অন্য কোন আশা নিয়ে নয়, এ কেবল ট্যাক্সির বিকল্পে বাসে ওঠা। নইলে হিমাংশুকে দেখে শ্রীলেখা যদি মুখ ফিরিয়ে থাকে, চিনতে না পারার ভান করে তাহলেও হিমাংশুর কিছু বলার নেই। তিন বছর আগে যে সম্পর্ক চুকে বুকে গেছে, যে সূতো নিজের হাতে ছিঁড়ে দিয়েছে, সে সূতো ধরে আর এগোবার সাহস নেই হিমাংশুর। তিন বছর আগের শ্রীলেখার এক লাইনের সেই এনভেলাপটার কথা ওর মনে পড়ল, "একবার শুধু দেখা ক'রে যেও, ভয় নেই, আটকে রাখব না।" কিন্তু মা আটকে রাখলেন, বললেন, "ও বাড়িতে তোমার আর যাওয়া হবে না খোকা, হাজার চিঠি এলেও না।" চিঠিটা ছিঁড়ে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়েছিল হিমাংশু। জবাব দেয়নি, দেখা করেনি, কিন্তু আবার দেখা হয়ে গেল। হিমাংশুর অনুমান ভুল। শ্রীলেখা মুখ ফিরিয়ে রইল না। খুশির চোখ তুলে তাকাল ওর দিকে। যেন হিমাংশুকে না পেলে, এমন একজন সঙ্গী না পেলে এই গুমোটে দম আটকে মরত শ্রীলেখা।

নিজের পাশে জায়গা ছেড়ে দিয়ে বলল, "কেমন আছ বল না। তোমার দিল্লীর চাকরির খবর রাখি, কিন্তু কলকাতা কখন আসা-যাওয়া কর সে খবর পাই না। কবে এসেছ দিল্লী থেকে ?"

হিমাংশু বলল, "কবে যাচ্ছি তাই বল। ছুটি ফুরিয়েছে। আজ শেষ দিন। কাল দুপুরেই আবার ছুটতে হবে।"

"ওমা, কালই চলে যাবে! তাহলে বাসা পর্যন্ত টেনে না নিয়ে ছাড়ছি না কিন্তু।"

হিমাংশু ভদ্রতা ক'রে বলে, "কাজ ছিল একটু।"

হেসে উড়িয়ে দেয় শ্রীলেখা। "হ্যাঁ, কত কাজ তোমার। থাকে তো কাল সকালের জন্যে তুলে রাখ।"

কোন ওজর-আপত্তিই শুনবে না শ্রীলেখা। আজকের এই বিকেলটুকু শুধু হাতে। ওকে আদর ক'রে বাসায় নিয়ে গিয়ে নিজের খাটে বসিয়ে কয়েকটা কথার চাবুক না মারা পর্যন্ত যেন ওর স্বস্তি নেই। যে চাবুক শ্রীলেখা তিন বছর ধরে মনের মধ্যে সাজিয়ে রেখেছে। খোঁজ-খবর ক'রে দিল্লীর ঠিকানা যোগাড় করেছিল, ভেবেছিল মিষ্টি মিষ্টি ক'রে কয়েকটা চিঠি ছাড়বে। কিন্তু তাতে কি সবটুকু জ্বালা মিটত? কি দোষ করেছিল শ্রীলেখা যে, এতখানি এগিয়ে এসে শেষ পর্যন্ত হিমাংশু পালিয়ে বাঁচল। মা, কেবল মা আর মা। মা যেন আর কারো নেই, আর কারো থাকে না। চিঠি না লিখে ভালই হয়েছে। চিঠি লিখে এতটা হ'ত না। মুখোমুখি বসে চলতে ফিরতে ছোট ছোট কথার হুল ফুটালে আরেক জনের মুখের ভাবটা কেমন হয় সেটা দেখা যেত না তা হলে।

জানালা থেকে মুখ ফিরিয়ে শ্রীলেখা বলল, "ভাল কথা, তোমার মা কেমন আছেন? তিনি তো বুঝি দিল্লীতে তোমার কাছেই!"

হিমাংশু বলল, "না, তিনি নেই। গত বছর মারা গেছেন।"

"মারা গেছেন? আহা ছেলের বিয়েটা দেখে যেতে পারলেন না।"

হিমাংশু এবার বুঝতে পারে, এ দরদ মায়ের জন্যে নয়, শ্রীলেখা পুরনো দিনের ঝাল তুলছে। ওর আদর আপ্যায়নের অর্থটা পরিষ্কার হয়ে যায়। শ্রীলেখা সব খবরই রাখে তা হলে।

সামান্য হাসার চেষ্টা ক'রে হিমাংশু জবাব দেয়, "সব বিয়ে কি সবার ভাগ্যে দেখা হয়ে ওঠে। তোমার বিয়ের খবরই কি জানতাম। সেটা জানলাম আজ। এখন। বিয়ে করেছ দেখতে পাচ্ছি, আর কি করছ ?"

"যা শুনলে খুশী হবে, তাই করছি, মাষ্টারী। দু'জনের রোজগার জোড়া দিয়ে সংসার চলে। চল, সেই জোড়া-তালির সংসার দেখতে তোমার মজাই লাগবে।"

কিন্তু রাগ যেটুকু তাপ যেটুকু পথেই তা জল হয়ে যায়। পদ্মপুকুরের গলিতে পা দিয়ে সব প্রতিজ্ঞা ভেসে যায় শ্রীলেখার। তা কখনও পারা যায় না। তিন বছর ধরে যে দূরে থেকেও মন জুড়ে বসে আছে, কাছে পেলেই তাকে কথা শোনান যায় না। দরজার তালা খুলে হিমাংশুকে ঘরে এনে বসাল শ্রীলেখা। বসতে হ'ল খাটের উপরই। সখ থাকলেও ভাল দু'খানা চেয়ার ফেলবার যায়গা নেই, ছোট ঘর। তাছাড়া কোন কিছুর সখই কি আছে শ্রীলেখার ? ঘর দেখলে তা মনে হয় না। সব কিছুই কেমন ছড়ান ছিটোন আগোছাল। ঘর-সংসারে ওর মন নেই, ঘরময় কেবল মেজাজের চিহ্ন আছে।

একটা আলনার পেরেক খুলে গিয়ে বিশ্রীভাবে ঝুলে রয়েছে। সেটা আর ঠিক করা হয়নি। তক্তপোষের একপাশে পাঁজা করা কতগুলি বাসি জামা-কাপড়। তাকের উপর কাঁচের ফুলদানিটার

কানা ভাঙা। রাগ ক'রে একদিন ঠেলে ফেলে দিয়েছিল কিনা কে জানে। আরেকজন গিয়ে হয়ত ফের কুড়িয়ে এনেছে। সেই আরেক জনের দিকে এতক্ষণে চোখ পড়ল হিমাংশুর। দেয়ালের এক কোণে তার জায়গা হয়েছে। এই ফটো টাঙানোর জায়গা নিয়েও হয়ত স্বামী-স্ত্রীতে মল্লযুদ্ধ হয়ে গেছে একদিন। হওয়াই উচিত। ঐ চেহারায় ফটো তুলতে লজ্জা করল না অখিলেশ্বরের। শ্রীলেখার স্বামীর নামটা জানল হিমাংশু ফটো থেকেই। ফটোর নীচে বেশ বড় বড় অক্ষরে ইংরাজীতে নাম লেখা। আশ্চর্য রুচি লোকটার। হাতে মাথা রেখে খাটের উপর আরামে আধশোয়া হ'ল হিমাংশু। ঘরে পাখা নেই অতএব গরম আছে, খোলা জানালা দিয়ে এতটুকু হাওয়া আসছে না। না আসুক, গরমটা এখন আর অসহ্য লাগছে না হিমাংশুর।

শ্রীলেখা এক ফাঁকে কাপড় বদলে কোমরে আঁচল জড়িয়েছে। আয়োজন করছে চা-র। এখান থেকে সব দেখা যায়, দেখা যায় ওর বারন্দায় অযত্নের সংক্ষিপ্ত গৃহস্থালী। আর চোখে পড়ে শ্রীলেখার আঁচল ঘেরা সরু কোমরটুকু। চমৎকার নাচের ফিগার ছিল শ্রীলেখার।

গরম দেখে হাত পাখাটা এগিয়ে দিতে এল শ্রীলেখা।

কাছে পেয়ে হিমাংশু বলল, "এমন হুট ক'রে বিয়ে ক'রে বসবে ভাবিনি।"

তবু ভাল, হিমাংশুর এখন একটু আফশোস হয়েছে, একটু কষ্ট লাগছে শ্রীলেখার জন্যে। খুশী হয়ে শ্রীলেখা বলল, "আহা, বিয়ে না করলেই যেন কত খোঁজখবর নিতে; এই যে তিন বছর নিখোঁজ হয়ে আছি, কত খবর নিয়েছ কত চিঠি দিয়ে জিজ্ঞেস করেছ।"

হিমাংশু বলল, "চিঠি তো তুমিও দিতে পারতে।"

শ্রীলেখা একটুকাল চুপ ক'রে থেকে বলল, 'তা পারতাম। কিন্তু জবাব পেতাম না। আমার শেষের চিঠিটার জবাব দিয়েছিলে?"

"আজ দেব," হিমাংশু হাসতে থাকে।

আসতে আসতে একেবারে খাটের পাশ ঘেঁষে দাঁড়ায় শ্রীলেখা।

হিমাংশুর ঝুলে-পড়া 'টাই'টা হাতে নিয়ে বলে, "চমৎকার রং কিন্তু টাইটার।" টাই ছেড়ে কখন হাত নেমে আসে কাঁধের উপর।

শ্রীলেখা বলে, "ক' বছরে কি মোটাই হয়েছ!"

সামান্য একটু হাতের ছোঁয়া। সেই ছোঁয়া লেগে একটা ঘুমের মানুষ যেন জেগে উঠল। হিমাংশুর মনে হ'ল ভারী একটা অবিচার করেছে শ্রীলেখার উপর। করেছে মা-র সঙ্গে জেদাজেদি ক'রে। আজ আর কিছু করবার নেই। আবার থাকবেই বা না কেন? শ্রীলেখাই বা কোন্ সুখে আছে এখানে? শ্রীলেখার কথার জের টেনে হিমাংশু হেসে বলল, "চল না আমার সঙ্গে। দিল্লীতে থেকে তুমিও না হয় একটু মোটা হয়ে আসবে।"

শ্রীলেখা বলল, "তা হলে তো বেঁচে যাই। দু' বছরের মধ্যে কোথাও যদি একটু পা বাড়িয়ে থাকি হিমাংশু। এই বাড়ি ছেড়ে কোথাও না। একেবারে খাঁচাবন্দী হয়ে আছি।"

হিমাংশু বলল, "কিন্তু দিল্লী নিয়ে ফের যদি আমার খাচায় পুরি আর ছেড়ে না দিই? সেখানে আমার বাসায় কিন্তু আর মানুষ নেই, ভুলে যেও না।"

শ্রীলেখা হাসতে হাসতে বলল, "ধরে রাখতে পার রাখবে। আমার আপত্তি নেই।"

"কিন্তু আরেকজনের আছে। অখিলেশ্বর ছাড়লে তো।"

শ্রীলেখা হেসে বলল, "তাকে বুঝিয়ে সুজিয়ে রাজি করা যাবে।"

"না না, ঠাট্টা নয়।" শ্রীলেখার একটা হাত টেনে নিয়ে হিমাংশু বলল, "কাল দুপুরে কিন্তু সত্যি গাড়ি নিয়ে আসব। দিল্লী না যাও চল বোটানিক্যাল থেকে ঘুরে আসি দুজনে।"

ওর চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে শ্রীলেখা বলল, "এসো।"

জোরে হাওয়া দিয়ে উনুনে নতুন ক'রে আঁচ তুলল শ্রীলেখা। বেশী কিছু নয়, চায়ের সঙ্গে শুধু একটা ডিমের পোচ্। তার বেশী কিছু হিমাংশুকে খাওয়ান গেলে তো। ও তো আর অখিলেশ্বরের মত রাক্ষস নয়। কিন্তু এইটুকু করতেই গরমে আর আগুনের তাপে শ্রীলেখা ঘেমে অস্থির। ওর মুখের দিকে আর তাকান যাচ্ছে না। কপাল ভর্তি ঘামের ফোঁটা। ঠোঁটের উপর ঘাম মুক্তার মত টলমল করছে। গালের উপর কিছু খুচরো চুল ঘামে লেপ্‌টে গেছে একেবারে।

হঠাৎ অখিলেশ্বর এসে হাজির হ'ল। খোলা দরজা পেয়ে কাউকে ডাকার দরকার হয়নি। বিনা নোটিশে এসে পড়েছে। শ্রীলেখার স্কুলের মত ওরও আজ শনিবারের অফিস। একেবারে বাজার ঘুরে এসেছে। বিকেলের বাজারে দু'হাত জোড়া।

শ্রীলেখা ধমক দিয়ে উঠল, "হাঁ ক'রে তাকিয়ে দেখছ কি। আমার বন্ধু, একসঙ্গে কলেজে পড়েছি।"

বন্ধুর দিকে নয়, শ্রীলেখার দিকেই তাকিয়ে ছিল অখিল। ধমক খেয়ে বলল, "ওঃ, কিন্তু তুমি দেখি ঘামে একেবারে নেয়ে উঠেছ।" অখিল তাড়াতাড়ি হাতের বোঝা নামিয়ে কোঁচার খুঁট দিয়ে শ্রীলেখার মুখের ঘাম মুছে নিল। মুখের ঘাম মুছল কিন্তু শ্রীলেখার মুখের

লাল রং গেল না। রাগে যেন ফেটে পড়তে চাইছে শ্রীলেখা। একটু যদি কাণ্ডজ্ঞান থাকে লোকটার। কাণ্ডজ্ঞান যেটুকু বা ছিল, শ্রীলেখার চোখের দিকে তাকিয়ে সেটুকুও বুঝি হারাল অখিল। একেবারে অপ্রস্তুত, হতভম্ব।

হিমাংশু চুপ ক'রে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। মনে হ'ল অখিলেশ্বরের মত এমন ক'রে কি ভালবাসতে পারত হিমাংশু! একটা মানুষের মনের নাগাল না পেয়েও এতখানি ভালবাসা!

চা খাওয়া শেষ হলে হিমাংশুকে গলির মুখ পর্যন্ত এগিয়ে দিল শ্রীলেখা।—আস্তে আস্তে বলল, "কাল দুপুরে আসছ তো?"

মুখ ফিরিয়ে হিমাংশু হেসে বলল, "পাগল! ঠাট্টাটুকুও বোঝ না। কাল সকাল থেকে আমার কত কাজ।"

এক রঙের পাখি

গাড়িটা থামল একটু শব্দ ক'রেই, অথবা ওটা ভবেন্দুরই কারসাজি। আচমকা ব্রেক কষে ভবেন্দুই তুলল শব্দটা। আশেপাশের লোক-গুলোকে জানিয়ে দিল, ভবেন্দু এসেছে, গাড়ি নিয়ে এসেছে, তারপর ঝুলান কোঁচা সামলে গোল্ডফ্লেকের টিনটা হাতে ক'রে দোকানে এসে ঢুকল।

এই ঘড়ির দোকানে চৌরাস্তার এই জয় হিন্দ ওয়াচ কোম্পানিতে প্রথম যেদিন ঢুকেছিল ভবেন্দু, সেদিন ওর চাল-চলনে একটু জড়তা ছিল। ঢুকেছিল চোরের মত ভয়ে ভয়ে, হাজার ফিসফিসানির হাওয়া কেটে। কোণের দিকটায় যে ছোঁড়া দুটো এখন চোখে ঠুলি এঁটে টাইমপিসের কলকব্জার উপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে, ওরাও সেদিন গা টেপাটেপি করেছিল। বুঝিয়ে দিয়েছিল, ভবেন্দুর ঘড়ি দেখাতে আসাটা ছল, আসলে এসেছে মেয়েটার টানে। ওদের দোকানের সেলস্ গার্ল—যে মেয়েটি সেজেগুজে কাউণ্টার আলো ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। নইলে 'ওমেগা' কোম্পানীর দামী রিস্টওয়াচ অয়েল করাবার আর দোকান পেল না ভবেন্দু, ছোঃ, কিন্তু সে ছিল প্রথম দিন।

তারপরে আরও বহুদিন এসেছে ভবেন্দু। কোনদিন পায়ে হেঁটে, কোনদিন বা গাড়ি নিয়ে। ভবেন্দু এখন এ-দোকানের একজন বড় পেট্রন। পরম বন্ধু। বন্ধু-বান্ধবের ঘড়ি চেয়ে এনে অয়েল করার কাজ ধরিয়ে দিয়েছে। এই এক মাসে ওর মারফতেই তো দুটো টাইমপিস, একটা রিষ্টওয়াচ বিক্রি হয়ে গেল। তাছাড়া

আরও একটা উপকার হয় ভবেন্দুকে দিয়ে। মাঝে মাঝে ওর গাড়িটা পাওয়া যায়। কতদিন ওকে দোকানে বসিয়ে রেখে ভবেন্দুর গাড়ি নিয়ে উধাও হয়েছে শ্যামাদাস। ঘড়ি-পাড়ার জরুরী কাজগুলো সেরে এসেছে। এ-সব উপকার শ্যামাদাস মনে রাখে, খতিয়ে দেখে। দেখে ব'লেই ভবেন্দুর এত আদর এ-দোকানে। ভবেন্দু এলেই শ্যামাদাস মিঠে পান আনিয়ে দেয়, কোনদিন চায়ের অর্ডার দেব দেব করে। শ্যামাদাসের বরাত ছাড়া কি! ভবেন্দুদের মত দু'পাঁচজন ভদ্রলোক আসা-যাওয়া করে ব'লেই না শ্যামাদাসের দোকান চালু আছে। নইলে এই বেপট্টি-বেপাড়ায় কে পুছত ওর ঘড়ির দোকান? কিন্তু ভবেন্দু আসে কিসের টানে? সেটা আর কারো বুঝতে বাকি নেই। না থাক, ভবেন্দুও এখন আর পরোয়া করে না। গুজগাজ ফিসফাস গায়ে মাখে না। বিকেলের দিকে লুট ক'রে এসে এক এক দিন দোকানে ঢোকে। কাউন্টারের ও-পাশের লোহার চেয়ারটায় গা এলিয়ে দেয়। মেয়েটির সঙ্গে একটু গল্প-গুজব হাসাহাসি হয়। বেড়ে কাটে বিকেলটা। ভবেন্দু ভাবে এটুকু তার ন্যায্য পাওনা, তাছাড়া সাজান-গুজান, ফিটফাট, বেওয়ারিশ একটি মেয়েই যদি রাখতে পার, তবে তার সঙ্গে একটু হাসাহাসি করা বা দুটো বে-লাইনের কথা বলার মধ্যে দোষের কি থাকতে পারে ভেবে পায় না ভবেন্দু।

কিন্তু আজ দোকানে পা দিয়েই ভবেন্দু অবাক হয়ে যায়। এ দেখি আরেকটি সুচিত্রা হয়ে গেল তাহলে। 'ছাট মাইলড টিমিড গার্ল'। বাট দিজ ইজ এ নাইসার এ ব্রাইটার ওয়ান।' না, নজর আছে শ্যামাদাসের। বেছে বেছে কোত্থেকে যে জোটায় একেকটি, আর মেক আপের ডিরেক্টার বোধ হয় ও নিজেই। সাজগোজ

করিয়েছে অনেকটা স্মুচিত্রার মত। গলায় মোটা কালো কারে বাঁধা নকল মুক্তার মালা, চৌকো ক'রে খোপা বাঁধা। চোখে মোটা দাগের কাজল, হাতে ক্ষুদে লেডিস রিস্টওয়াচ। জাস্ট লাইক এ বার্ড! সিগারেটের টিনটার উপর ছুবার বুড়ো আঙ্গুলের চাপ দিল ভবেন্দু, তারপর নিজেই চেয়ারটা কাছে টেনে নিয়ে বলল—

"আপনি বুঝি নতুন ?"

মিষ্টি একটু হেসে চিত্রিতা বলল, "হ্যাঁ, কিন্তু আপনার কথা এসে ইস্তক শুনছি। আগে নাকি প্রায়ই আসতেন। অথচ আমি আসার পর এলেন এই প্রথম।"

ভবেন্দু খুশী হয়। সিগারেটের টিনটা ধীরেস্থুস্থে খোলে এবার। বলে, "সময় পাই কোথায়। নিজের ছোটখাট একটু বীজনেস আছে, সেটা দেখতে হয়।"

চিত্রিতা বলল, "জানি। ছোটখাট নয়, বেশ বড় অফিসই। স্ট্র্যাণ্ড রোডে। ইমপোর্টের বিজনেস।"

ভবেন্দু জোরে হেসে উঠল। বলল, "এর-মধ্যে সবই জেনে ফেলেছেন দেখছি।" ওর হাসির শব্দে একটু বুঝি লজ্জা পায় চিত্রিতা। অথবা লজ্জা পাওয়ার ভান করে। চোখ নামিয়ে বলে, "জানতে হয়। দোকানের জন্যে আপনি কত করেন।" এটুকু ভবেন্দুর সঙ্গে ভব্যতা। ওকে আপ্যায়িত করা। ওকে খুশী রাখার মতলবে শ্যামাদাসের কাছ থেকে শেখা বুলি। তবু খারাপ লাগে না। লজ্জায় নত চোখের দিকে চেয়ে বেশ লাগে ভবেন্দুর। শুধু আপ্যায়ন নয়, তার সঙ্গে আরও কিসের যেন একটু আমেজ মিশে আছে। কাউন্টারের উপর একটা হাত রেখে ভবেন্দু তাকিয়ে থাকে। কিছুদিন আগে ওর জায়গায় ছিল স্মুচিত্রা, দেখতে অনেকটা একই রকম। অবশ্য

রংয়ের তফাত আছে। তার চেয়ে এ-মেয়েটি একটু বেশী ফর্সা, একটু বেশী চটপটে। সুচিত্রা কথা বলত কম। তবে তাকাত সোজাসুজি। চোখে চোখে ভবেন্দুর যখন প্রায় তন্ময়-তদ্গত অবস্থা তখন শ্যামাদাস এল গুটিগুটি। এতক্ষণ একটা খদ্দের নিয়ে ব্যস্ত ছিল, এবার একেবারে কাছে এসে দাঁড়াল। হাত মুচড়ে বিনীতভাবে বলল—

"স্যার, চা আনাই একটু।"

ভবেন্দু বাঁ হাতের সিগারেট টিন তুলে থামায় ওকে, "থাক, দরকার নেই।"

"তাহলে পান আনাই, পান খান।"

বিদায় করার ভঙ্গিতে ভবেন্দু হাতের ইসারা করে, "আনান একটা।"

মোটের উপর শ্যামাদাস কিছু একটা ভদ্রতা করতে চায়, অনেক দিন পরে এসেছে ভবেন্দু। অনেক দিন পরে পাওয়া গেছে গাড়িটা, রাধাবাজার থেকে টুকিটাকি ঘড়ির পার্টস কিছু আনা দরকার। সেই ফাঁকে ওদিকের খুচরো কাজগুলি একেবারে সেরে আসা। বন্ধু-বান্ধবেরও খোঁজ-খবর ক'রে আসা সম্ভব হলে। ট্রামে-বাসে যাওয়া মানেই তো কতগুলি কাঁচা পয়সার শ্রাদ্ধ। সে-পয়সাটা খরচ লেখ ভবেন্দুর নামে। মানে চাপ ওর গাড়িতে।

কিন্তু শ্যামাদাসের সে প্ল্যান ফসকে যায়। শ্যামাদাস বলবে কি, তার আগে ভবেন্দুই উঠে দাঁড়ায়। করজোড়ে মিনতির ঢংয়ে বলে, "আপনার মিসকে একটু ধার দিতে হবে শ্যামাদাসবাবু। বন্ধুর বিয়ে, টুকিটাকি মার্কেটিং আছে, ও সব মেয়েলী ব্যাপারের আমরা কি বুঝি বলুন তো।" তারপর চিত্রিতার দিকে তাকিয়ে বলল, "যাদের বোঝার তারা বোঝে।"

"নিন, গাড়িতে উঠুন চটপট। ভয় নেই, ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ছেড়ে দেব, আই মিন, পৌঁছে দিয়ে যাব।"

চিত্রিতাকে এক রকম যেন জোর ক'রে নিয়েই গাড়িতে তোলে ভবেন্দু।

শ্যামাদাসের মনে হয়, এটা ভবেন্দুর বাড়াবাড়ি। একেবারে মার্কেটিং করার জন্যে দোকান থেকে মেয়ে তুলে নিয়ে যাওয়া। কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলবারও উপায় নেই। ভবেন্দুকে চটাতে সাহস হয় না। ভবেন্দু এ দোকানের পেট্রন, দোকানের পরম বান্ধব ভবেন্দু সেন।

গাড়িতে বসতে পেরে ভবেন্দু যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল, দোকানের মধ্যে এর-ওর আসা-যাওয়া। দোকান ছেড়ে শ্যামাদাসের নড়বার নাম নেই। আর কারণে-অকারণে মিস্ত্রি ছোঁড়া দুটোর খিলখিল হাসি সবচেয়ে অসহ্য। না যায় নিরিবিলিতে দুটো কথা বলা, না যায় একটু চোখ তুলে তাকান। হাজার হোক রাস্তার উপরে দোকান, এখন ওসব বালাই নেই। পিছনে হেলান দিয়ে বেশ আরাম ক'রে বসল ভবেন্দু। চিত্রিতা বসল পাশে। তারপর ড্রাইভার রামদেওকে ভবেন্দু হুকুম করল, "চলো ধরমতলা।"

ভবেন্দু বলল আস্তে আস্তে, "আপনাকে কিন্তু একটা ভড়কি দিয়ে, একটা মিছে কথা ব'লে নিয়ে এলাম। বন্ধুর বিয়ে ফিয়ে ওসব বাজে কথা। আসলে একটু ঘুরে বেড়ান, এই আর কি—"

আহা, তা যেন চিত্রিতাই আঁচ করতে পারেনি।

চিত্রিতা হেসে বলল, "তাতে কি হয়েছে।"

ভবেন্দু বলল, "না হয়নি কিছুই, কিন্তু এতো একরকম জোর ক'রে ধরে নিয়ে আসা, আপনি আবার কিছু ভাবলেন কি না কে জানে।"

"না না, এতে ভাবাভাবির কি আছে? ব্যাপারতো এক ঘণ্টার, একেবারে তো কোথাও নিয়ে যাচ্ছেন না।"

মুখ ফিরিয়ে তাকাল ভবেন্দু, "একেবারে নিয়ে যাওয়া" কথাটার ওজন বোঝার চেষ্টা করল। ঠিক বোঝা যায় না, হাওয়াটা কোন্‌দিকে বইছে।

গাড়িতে বসেছে একটু দূর বাঁচিয়ে, কোণ ঘেঁষে ছোট্ট একটা পাখির মত। আশ্চর্য! ওকে প্রথম দেখেও ভবেন্দুর পাখির তুলনাটাই মনে এসেছিল। এ বার্ড, এ নাইস লিটল বার্ড। কেমন একটু মায়া ধরে যায় মেয়েটার উপর। মুখটা শুকনো শুকনো, হয়ত টিফিন ঠিফিন কিছুই করেনি এখনও। করবেই বা কোত্থেকে, কতই বা মাইনে পায়। ঐ দোকান থেকে কত আর দিতে পারে শ্যামাদাস।

হঠাৎ ভবেন্দু বলল, "আসুন, নেমে কিছু খেয়ে নেওয়া যাক।"

চিত্রিতা বাধা দিয়ে বলল, "না না, আমি একটু আগে টিফিন খেয়েছি, অবশ্য আপনি কিছু খেতে চান তো, আলাদা কথা।"

ভবেন্দু হেসে বলল, "না, কথা একই। আপনারও খাওয়া দরকার। যেটা বললেন, সেটা মিছে কথা। টিফিন আপনারও খাওয়া হয়নি।"

ধরা পড়ে গিয়ে চিত্রিতা একটুকাল চুপ ক'রে রইল, তারপর বলল—"কী ক'রে বুঝলেন?"

ভবেন্দু জবাব দিল, "মুখ দেখে।"

চিত্রিতা বলল, "মুখ দেখেই বুঝি সব বোঝা যায়?"

একটু সোজা হয়ে বসে ভবেন্দু বলল, "তা যায়। কার কতটুকু খিদে সেটা মুখের দিকে চাইলেই ধরা পড়ে। আপনিও ধরতে পারেন।"

অর্থাৎ পাখির গায়ে ছোট্ট একটা তীর ছাড়ল ভবেন্দু, তারপর তাকিয়ে রইল ওর মুখের দিকে।

কথাটা এড়িয়ে গিয়ে চিত্রিতা আবার একটু হাসল। বলল, "না, একেবারে মিছে বলিনি। খেয়েছি, চা খেয়েছি বিকেলে।"

কিন্তু ভবেন্দু শুনল না। গাড়ি থামিয়ে ধর্মতলার ওর সেই পেটোয়া রেষ্টুরেণ্টে গিয়ে উঠল দুজনে। ভবেন্দু নিজে খেলো নামমাত্র। আসলে খেতে হলো চিত্রিতাকে। আশ্চর্য, পুরুষমানুষ যে এমন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে খাওয়াতে পারে চিত্রিতার তা জানা ছিল না। খাওয়ার পরে দুজনে পান খেলো। ধর্মতলার জর্দা দেওয়া মিঠে পান।

এখন আর গাড়ি নয়। গাড়ি নিয়ে রামদেও রইল একটু দূরে। আর ময়দানের নরম ঘাসের জমিতে ওরা শুধু দুজনে। দু'হাতে হাঁটু ধরে বসেছে মুখোমুখি। কিন্তু সুস্থ হয়ে বসার জো নেই। বড়ো বেয়াড়া হাওয়া দিচ্ছে। ঝোড়ো হাওয়া, চিত্রিতা শাড়ি সাম্লাতে পারছে না, কাঁধে আঁচল রাখা দায়। মেয়েদের বিব্রত বিস্রস্ত ভাবটাই সবচেয়ে ভাল লাগে ভবেন্দুর। হাওয়ার ঝাপটায় চিত্রিতা বিপন্ন; আর ভবেন্দুর মনে হ'ল, বিপন্ন ব'লেই ওর আসল রূপ খুলল এতক্ষণে। নাউ দ্য বার্ড ইজ ইন দ্য ষ্টরম।

আরেকটু কাছে সরে এসে ভবেন্দু বলল, কানে কানে বলার মত, "এতক্ষণ কাছাকাছি রয়েছি, অথচ নামটাও শোনা হয়নি। কি নাম যেন তোমার?"

চিত্রিতা একটুকাল চুপ ক'রে রইল, না আর আড়াল নয়, আর গোপন নয়। ভবেন্দুকে এখনই সব না জানিয়ে যেন স্বস্তি নেই ওর।

চিত্রিতা বলল, "আমার আসল নাম বিমলা। দোকানে নাম নিয়েছি চিত্রিতা। এর আগে যাকে দেখেছেন, সেও সুচিত্রা নয়। কমলা, আমার বড়বোন।"

ভবেন্দু বলল, "দু' বোনেরই তাহলে এক দোকানে চাকরি ?"

মুখ নিচু ক'রে বিমলা বলল, "হ্যাঁ, আর ও দোকানও আমাদের। আমার বাবার দোকান। বোঝেন তো যে দিনকাল। এ ফন্দিটুকুও বাবার। পালা করে এক মাস দিদি, এক মাস আমি। দোকানটুকু চলে তাই বেঁচে আছি, নইলে কে যে কোথায় ভেসে যেতাম।"

ভবেন্দু যেন আকাশ থেকে পড়ে, অবাক হয়ে শুধু বলতে পারে "ও"।

বিমলার বুঝতে বাকি থাকে না, ভারী একটা ধাক্কা খেয়েছে ভবেন্দু, হাঁটুর হাত ছেড়ে দিয়ে সেই হাতে ভর ক'রে পিছনে হেলে বসেছে। কিন্তু অত সহজে বিমলা ছাড়তে চায় না। মন ভিজাতে চায়। আদুরে গলায় বলে বিমলা, "আহা, দোকানীর মেয়ের বুঝি কোন সাধ থাকতে নেই। কাছে আসার অধিকার নেই।"

কিন্তু কথা তা নয়, ভবেন্দু ভাবছে অন্য কথা, অন্যটির কথা। আজ যেসব কথা বিমলাকে বলল, কমলাকেও তার অনেক কথাই শুনিয়েছে ভবেন্দু। আনেনি কেবল গাড়ি ক'রে। গাড়ি ক'রে একদিন নিয়ে এলে তাকেও কি ভবেন্দু এর সবগুলি কথাই বলত না ? আদর ক'রে কাটলেট খাওয়াত না ? কমলার কথা মনে পড়ছে ভবেন্দুর। যে মেয়ে কথা বলত কম, তাকাত সোজাসুজি, চোখে চোখে। আসলে তো ওরা দুজনেই এক।

ভবেন্দু থেমে থেমে বলল, "না, তা কেন। দোকানীর মেয়ে ব'লেই কেউ পচে যায় না। কিন্তু এবার তুমি ফিরে যাও বিমলা। এক ঘণ্টার অনেক বেশী হয়ে গেছে। এরপর শ্যামাদাসবাবু ভাববেন হয়ত।"

হ্যাঁ, সেই ভাল। রামদেও এবার ওকে পৌঁছে দিয়ে আসুক। ভবেন্দু হাত তুলে ডাকল, "রামদেও ইধার—"

মেঘমেদুর

এতক্ষণে বসবার জায়গা পাওয়া গেল একটু, লোকাল ট্রেণ শিয়ালদ' টু কাঁচড়াপাড়া। কতটুকুই বা রাস্তা। কিন্তু ধকলটা যেন ঢাকা মেলের, সেই লাইন দিয়ে টিকিট কাটা, ঢুকতে গিয়ে গেটের সাম্‌নে হুড়োহুড়ি। গাড়ীতে উঠেও কি স্বস্তি আছে? বসার জন্য মারামারি, কামড়াকামড়ি, ঠেলাঠেলি ভীড়। দু'টি চারটি ক'রে রেশন ব্যাগ পার হচ্ছিল এতক্ষণ, এবার প্রকাণ্ড তরকারীর ঝাঁকা একটা উঠে আসবার চেষ্টায় আছে। জানালার বাইরে মুখ ফিরিয়ে রইল পঞ্চানন। অসময়ে আকাশ ভরে মেঘ ক'রে আছে। ভেতরে চাপা গুমোট আর ক্লেদাক্ত ঘামের গন্ধ, পকেট থেকে রুমাল বার ক'রে ঘাড়-কপাল সে মুছে ফেলল। নাকি নেমে যাবে গাড়ী থেকে? কিন্তু সুরেনের চিঠি পাওয়ার পর দু'টি শনিবার এসে চলে গেছে, কাঁচড়াপাড়া যাওয়া আর হয়ে ওঠেনি। সুরেনের চিঠি বার করল অনেকবার, একথা ওকথার পর সুরেন লিখেছে, 'ভাই পঞ্চানন, জানি তোমার সময় কম, কিন্তু কাউকে কোন কাজের ভার দেব তিনকুলে তো এমন কেউ নেই আমার তুমি ছাড়া, তুমি বরং একটু কষ্ট ক'রে কোন এক শনিবার চলে যেও কাঁচড়াপাড়ায়। সুপারিন্‌টেণ্ডেন্টকে ধরে টরে যদি একটা বেডের ব্যবস্থা করতে পার। বাঁচব যে না, তাতো জানি। তবু শেষের ক'টা দিন যদি শুয়েপড়ে সরকারী খানা খেয়ে যেতে পারি, সেই বা মন্দ কি? আমার দরখাস্তের নকল আর ওদের চিঠি পাঠালেম এই সাথে।'

মাস চারেক হ'তে চলল সুরেন টি.বি. নিয়ে কলকাতা ছেড়েছে। আর কি করতে পারে পঞ্চানন? অফিসের কলিগের কাছ থেকে সুরেনই বা আর কত আশা করে? তারপর অফুরন্ত সময় যদি হাতে থাকত তাহ'লে না হয় দেখা যেত। পঞ্চাননেরও অফিস আছে, ঘরসংসার আছে, হাত-টানাটানি আছে, তবু কোনদিকে চায়নি পঞ্চানন। অসুখের গোড়া থেকে তার যেটুকু সাধ্য তা সে করেছে। আর্ধেক চার্জে এক্স-রে করিয়ে দেয়া থেকে শুরু ক'রে মায় ফল কিনে খাওয়ান পর্যন্ত। কিন্তু মানুষের স্বভাবই এমনি, কারো কাছ থেকে কোনরকমে সৌজন্যের স্বাদ যদি পেলো একবার, ত'হলে তার আর রক্ষা নেই। মাসে মাসে এখনও সুরেনের চিঠি আসে, 'এনজিয়ার্স ইমালসন ফুরিয়ে এল', 'পারতো ক্যালসিয়াম টেবলেট এক ফাইল।' দাম অবশ্য মাঝে মাঝে একেকবার পাঠিয়ে দেয় পরে। কিন্তু দামটাই তো সব নয়, তার পিছনেও হাঁটাহাঁটি আছে।

ভাঁজ না ক'রেই কাগজগুলি পঞ্চানন বুকপকেটে গুঁজে রাখল। পাশের বেঞ্চিতে জায়গা নিয়ে আরেক দফা বচসা শুরু হয়ে গেছে। মোটা গোছের একটা লোক কৌশলে সে দুর্যোগ এড়িয়ে এসে পঞ্চাননের পাশে বসে পড়ল। পাশে মানে তার উরুর ওপর নিতম্ব রেখে। পঞ্চানন হতবাক্‌। লোকটা কিন্তু অনর্গল বকে যাচ্ছে, 'ব্যাপার তো মোটে আধঘণ্টার। তারপর কার বা জায়গা, কে বা বসে। সবই তো খালি পড়ে থাকবে, নামবার সময় কেউ কি একবার পিছন ফিরেও চেয়ে দেখবেন? না কি বলুন?' মুখে কথা বলছে আর ওদিকে ঠেসেঠুসে জায়গা ক'রে নিচ্ছে। এরপরে আর কার কি বলার থাকতে পারে? নির্লজ্জতারও একটা সীমা আছে। গণদেবতার নামে চোখে

যাদের জল আসে, পঞ্চাননের ইচ্ছে হলো তাদের কাউকে নিজের জায়গায় বসিয়ে দিয়ে সে উঠে দাঁড়ায়।

গাড়ী যখন কাঁচড়াপাড়া গিয়ে পৌঁছল বেলা তখন পাঁচটা বেজে গেছে। টিপ্ টিপ্ ক'রে বৃষ্টি পড়ছে, আকাশ-জোড়া মেঘ এবার একটু একটু ক'রে গলতে শুরু করেছে। ষ্টেশনে লোকজন একেবারে কম, হয়ত এই বৃষ্টির জন্যই। ওপারে সেডের মধ্যে তিন-চার জন লোক বেশ গুছিয়ে বসে বিড়ি টেনে টেনে গল্প করছে! পোঁটলা-পুঁটলি আশে-পাশে আছে দু'একটা। কিন্তু ওদের ভাব দেখে মনে হয় না যে যাবার তাড়া আছে কোন, অপেক্ষায় আছে কোন ট্রেণের জন্য। রেলওয়ে-পোষাকপরা এক ভদ্রলোক, এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ষ্টেশন মাষ্টার হবেন বোধ হয়, বাইরে এসে একবার আকাশের দিকে ঘাড় তুলে তাকালেন, তারপর আবার নিঃশব্দে গিয়ে ঢুকলেন রুমে। চারদিকে কেমন একটা অলস ঝিমিয়ে-পড়া ভাব। পঞ্চাননের মনে পড়ল, অফিস থেকে বেরিয়ে অবধি চা খওয়া হয়নি। দোকানের চা খেতে পারে না। নিদেন ঠেকায় পড়লে কচিৎ কোনদিন এক আধ কাপ হয়! হঠাৎ মনে পড়ে গেল অনিমার কথা, বাসার কথা। এইটুকু দূরে এসেই মনে হচ্ছে যেন কত দূর—বিদেশে এসে পড়েছে। অনিমাদের চায়ের পাট এতক্ষণে সারা হয়েছে নিশ্চয়ই। আজ আর সে বসে নেই—অফিসে আসার সময়ই পঞ্চানন জানিয়ে এসেছে কাঁচড়াপাড়া হয়ে ফিরবে আজ।

চায়ের ষ্টলে ঢুকে দেখল সেখানেও ভীড় নেই, মুখোমুখি বসে দুটি ছোকরা চা খাচ্ছে, খাকির সার্ট-প্যাণ্ট পরা, বোধ হয় রেলওয়ে ওয়ার্কসপেই কাজ করে, ওদের সারা গায়ে বৃষ্টির ছাট লেগেছে, হয়ত বৃষ্টির মধ্যে কোথাও ঘোরাঘুরি ক'রে এসে চায়ের কাপ সামনে রেখে

আয়েস করছে। একজন আবার চায়ের টেবিলে তাল ঠুকে চাপা গলায় একখানা ইমনকল্যাণ আলাপ করছে। বেশ গলাটুকু ছোকরার, তাল-তেহাই জ্ঞান আছে, চা খেতে খেতে গানের কলি দুটি বড় ভাল লাগলো পঞ্চাননের, ইচ্ছে হলো ওখানে চুপচাপ বসে থাকে আরও অনেকক্ষণ। কিন্তু ওরা উঠে পড়তেই পঞ্চাননের মনে পড়ল তাকেও যেতে হবে, যেতে হবে খুঁজে খুঁজে জিজ্ঞেস ক'রে ক'রে। ওদের ডেকে ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করল পঞ্চানন—

'নতুন টি.বি. হসপিটাল হচ্ছে এখানে একটা, সেটা কোন্‌দিকে বলুনতো ?'

'সে তো এখানে নয়।' বলল একজন, 'তা প্রায় মাইল ছয়েক হাঁটতে হবে আপনাকে, রিক্সা নিতে পারেন, কিন্তু এই বাদলার দিনে দেড় টাকা হেঁকে বসবে। তার চেয়ে হেঁটেই চলে যান, রেললাইনের পাশ ধরে এই এক রাস্তা।'

অগত্যা হাঁটতে হ'ল, লেভেল-ক্রশিং পার হয়ে মসৃণ চওড়া রাস্তা এঁকে বেঁকে চলে গেছে ডানদিকে, আমেরিকানদের কি একটা ঘাঁটি বসেছিল মাঠের মধ্যে, সেই প্রয়োজনে এই রাস্তা, যুদ্ধের সময়কার। কয়েক মাস আগেও বেপরোয়া জীপকার ছুটত এই পথ দিয়ে দিবা-রাত্র। শক্ত মজবুত চাকার পিছনে পীচের মসৃণ পথ পিছলে পড়ত। সে প্রয়োজন আজ ফুরিয়েছে, আজ সে রাস্তা গাড়িহীন, মানুষজন চলে কি চলে না। কিন্তু পঞ্চাননের গতি না বাড়িয়ে উপায় নেই, কাজ সেরেই আবার ফিরে যাওয়ার গাড়ী ধরতে হবে। কোলকাতা পৌঁছতে কত রাত হবে ঠিক কি ? মাথার ওপর টুপ্‌ টুপ্‌ ক'রে বৃষ্টি প'ড়ে সমস্ত মাথাটা প্রায় ভিজে উঠেছে। একটানা ছিঁচকে বৃষ্টি, জোরেও আসছে না, আবার থেমেও যাবে না। সারা বিকেল সারা

রাত এই তালে চলবে। অদৃশ্য স্নুরেনের ওপর মনে মনে জাতক্রোধে ফুলে উঠল পঞ্চানন।

আরও অনেকক্ষণ হাঁটার পরে পাওয়া গেল হাসপাতাল, হাসপাতাল এখনও কেবল গড়বার মুখে। অবশ্য তৈরি করার ভাবনা ভাবতে হয়নি। আপাততঃ সেটুকু আমেরিকানদের দৌলতেই মিলে গেছে। এ্যাজবেসটসের সেড্ দেওয়া লম্বা ঘরের সার নিভুর্ল জ্যামিতিক পরিমাপে তোলা। ছবির মত সমান সোজা সোজা জানালা, আবার দুটো সারির মধ্যে পারাপারের লম্বা হল্। বেড়াহীন সরু সরু আস্ত গাছ সমান্তরাল ক'রে পোঁতা, তার মাথায় সেড্। পায়ের তলায় ঘাস, কচি সবুজ ঘাস ঘরগুলির কোলে কোলে। খাট লম্বা ঘাস কমপাউণ্ড ছাড়িয়ে যতদূর চোখ যায় সেই পর্যন্ত। ঢুকবার রাস্তার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়ালে মনে হবে ঠিক যেন একটা দ্বীপের মত। সম্পূর্ণ আলাদা। এ জায়গা থেকে কোনদিকে যাওয়া যায় না, যাওয়ার দরকারের কথা মনে পড়ে না। এর ছ' মাইল পশ্চিমে কাঁচড়াপাড়া নেই। ওপরে খোলামেলা আকাশ আর পায়ের তলায় কচি সবুজ ঘাস। ক'মাস আগে আমেরিকানরা এখানে নেচেকুঁদে চলে গেছে, ক'মাস পরে হয়ত রোগী-ডাক্তারের ভীড়ে এ জায়গা মুখর হয়ে উঠবে। মাঝখানের এই ক'টা দিন শুধু নীরব প্রতীক্ষায় নিথর হয়ে পড়ে আছে জায়গাটা।

না, একেবারে নিথর এখন আর নয়। সে কেবল মনে হচ্ছে এই বাদলার দিন ব'লে। না হ'লে, পঞ্চানন এগিয়ে গিয়ে দেখল, একটা ঘরের সামনে অফিস ব'লে বোর্ড ঝুলান রয়েছে। জানালার ভিতর দিয়ে চোখে পড়ে লোহার পেসেণ্ট-বেড্ দু'চারটা। টুকটাক জিনিষপত্রও আসা শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু অফিস বন্ধ হয়ে গেছে

অনেকক্ষণ, আজ আর কোন কাজ হবে না। অফিসের দারোয়ানের কাছেই পঞ্চানন একথা জানতে পারল। অবশ্য দারোয়ানের বেশ আর এখন তার নেই। চাপরাশ খুলে রেখে বারান্দায় বসে এবার সে অন্য ডিউটি দিচ্ছে। একটু দূরেই গরু চরে বেড়াচ্ছে একটা। অতঃপর কি করা যায় ভাবতে ভাবতে পঞ্চানন চেয়ে রইল সেই-দিকে। নিশ্চিন্ত আরামে গরুটা ঘাস চিবিয়ে যাচ্ছে, কুচুর কুচুর শব্দ উঠছে আর সেই তালে লেজ নড়ছে একটু একটু। পঞ্চানন একবার ভাবল ফিরে চলে যায়, সুরেনকে যাহোক দু'কথা বানিয়ে লিখে দিলেই চলবে। তার দোষ কি, সে তো এসেই ছিল। দেখা না হ'লে সে দোষ কার। সে দোষ সুরেনের কপালের। আবার ভাবল, এই পর্যন্ত এসে ফিরে যাবে! তার চেয়ে সুপারিনটেণ্ডেন্টের সাথে দেখা ক'রে শেষ কথাটা শুনে গেলেই তো হয়। তা হয়। অবশ্য সুপারিনটেণ্ডেন্টের কোয়ার্টার পর্যন্ত ধাওয়া করার হুকুম নেই কারো। অনুরোধে পড়ে দারোয়ান যে দূর থেকে দেখিয়ে দিচ্ছে এটুকুও তো বে-আইনী। তা হোক, কথাতো মোটে দুটি।

সামান্য একটু গিয়েই সুপারিনটেণ্ডেন্টের কোয়ার্টার। স্থায়ীরকম এখনও কিছুই করা হয়নি, তবু হাসপাতালের আগে আগে চলে কোয়ার্টার। পাকাপোক্ত না হোক বাঁকারীর ছোটখাটো গেটের নিষেধ উঠেছে সামনে। অপ্রশস্ত বারান্দার কিনারে কিনারে টবের আশ্রয়ে বিদেশী ফুলের গাছে ফুল দেখা দিয়েছে। গেটের সামনে এসে থেমে দাঁড়াল পঞ্চানন। মিঃ মুখার্জি একা নন। পাশে একটা আর্মচেয়ারে আরেকটি মেয়ে এলিয়ে আছেন। পঞ্চাননকে আসতে দেখে তিনি উঠে বসলেন। আর মুখার্জি এবার হাত-পা ছড়িয়ে দিতে চাইলেন খাড়া চেয়ারে বসে যতটা সম্ভব ততটা। বিরক্তিতে

আঙুলমোড়া বইটা পড়ে যেতে চাইল। পঞ্চানন বুঝতে পারল, বড় অসময়ের অভাজন হয়ে এসেছে সে, মেঘলা আকাশের নিচে একান্ত নিরিবিলিতে যে কবিতার সুর বাজছিল এতক্ষণ তার ছন্দপতন হ'ল। ঢোলা পাজামা আর ঢিলে ওভারঅলের নীচে মুখার্জি নিস্পন্দ হয়ে রইলেন কিছুক্ষণ, তারপর বললেন, 'পেসেণ্ট কোথাকার, আই মিন কোন্ ডিস্ট্রিক্ট্? লেটেষ্ট X'ray report এনেছেন সঙ্গে?'

পঞ্চানন তাড়াতাড়ি এগিয়ে ধরল। ভুরু কুঁচকিয়ে দরখাস্তে চোখ বুলালেন মুখার্জি। নিস্পৃহ অবহেলায় শব্দ ক'রে পড়ে গেলেন নাম, ধাম, ঠিকানা।

'মানিকগঞ্জ—that is Dacca? Sorry, ঢাকার সিট সব ফিল-আপ হয়ে গেছে,' আবার হাত বাড়ালেন রিপোর্টের জন্য।

কিন্তু রিপোর্ট কোথায় পাবে পঞ্চানন? সুরেন রইল দেশের বাড়ীতে, সেখানে বসে তো আর ফোটো তোলানো যায় না। ফের যদি ফোটো তোলাতেই হয় সেও তো কোলকাতায় এনেই, কিন্তু তার আগে এমন ভরসা তো পাওয়া চাই যে এখানে ভর্তি হতে পারবে, চিকিৎসা চলবে। না হলে অনর্থক টানা-হ্যাঁচড়া ক'রে কি লাভ। খরচও তো আছে। পঞ্চানন বুঝিয়ে বলতে চাইল একথা।

মুখার্জির ধৈর্যের বাঁধ ভাঙে ভাঙে।

'এত বোঝেন আর এটুকু বোঝেন না যে এখানে এসে মরবার জন্য রোগী ভর্তি করা হয় না। এনে ঢোকালেন আর দু'দিন ভুগে সাবাড় হ'ল, হস্‌পিটাল সেজন্য নয়। যাদের জন্য চেষ্টা চলবে কেবল তাদেরই আমরা নেব। আর তার বিচার হবে লেটেষ্ট রিপোর্ট দেখে। আপনার সুরেন বিশ্বাস, ছ'মাস আগে যাকে ধরেছে তার

অবস্থা আমরা দেখে নেব, না নিয়ে দেখব? সে ছাড়াও তো পেসেণ্ট আছে, জানেন Whole Bengal-এ টি.বি.-র সংখ্যা কত?'

পঞ্চানন তা জানে না, সে শুধু মনে মনে ভাবল, সুরেন মরে যাক্ দেশের বাড়িতেই। ওর চিকিৎসার দরকার নেই।

'Excuse me, আমার আরও কাজ আছে,' চট্ ক'রে মুখার্জি উঠে দাঁড়ালেন, তারপর ওভারঅলের দু'পকেটে হাত ঢুকিয়ে গট্‌গট্ ক'রে চলে গেলেন অফিসের দিকে।

পঞ্চাননও পা বাড়িয়েছিল, হঠাৎ পেছন থেকে চাপা গলার ডাক এল, 'দাঁড়ান।'

ফিরে দাঁড়াল পঞ্চানন।

'কোন্ সুরেন বিশ্বাস? একি জাফরগঞ্জের সুরেনবাবু?'—মিসেস মুখার্জি প্রশ্ন করলেন।

বিস্মিত হয়ে পঞ্চানন বলল, 'হ্যাঁ, কিন্তু আপনি চিনলেন কি ক'রে? আপনার জানাশোনা নাকি?'

মিসেসের মুখ হঠাৎ লজ্জায় আরক্ত হয়ে উঠল, কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে অপরাধীর ভঙ্গিতে তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, উনি আমার চেনা।'

'কোলকাতায় যখন চাকরী করত তখন থেকে বুঝি?'

'না, তারও আগে থেকেই।'

মুখার্জির কথার ধমকে পঞ্চানন এতক্ষণ ভাল ক'রে ওঁর দিকে তাকাবার সুযোগ পায়নি। হয়ত সাহসও না। এবার চোখ তুলে চেয়ে দেখল। পাতলা তন্বী চেহারা। চমৎকার ফর্সা চোখ-জুড়ান গায়ের রং। সযত্ন প্রসাধনের রূপটা গৌণ, কিন্তু তার স্নিগ্ধ সৌরভ এসে নাকে লাগছে। ছাইরংয়ের শাড়ি পরেছেন হয়ত আজকের আকাশের রংয়ের সাথে মিলিয়েই। ঘনবদ্ধ কবরীর খাঁজে আঁচল

লেপটে আছে অত্যন্ত আলগোছে, যে কোন মুহূর্তে খসে পড়লেই হলো। বড় বড় টানাটানা চোখের পাতায় কাজল নেই, তবু মেঘের ছায়ায় মনে হ'ল যেন কতকালের কাজল-পরা চোখ।

মিসেস মুখার্জি যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেছেন। ওঁর মন কি ফিরে গেল সেই আগের দিনে, স্নুরেনের চাকরি করারও আগের দিনগুলিতে? সে-দিনের ইতিহাস পঞ্চানন জানে না, কিন্তু ওঁর মুখের রেখায় তারা কি ধরা দিল না?

হঠাৎ তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'এখন কেমন আছেন উনি? ওঁর কি একবারও প্লেট নেওয়া হয়নি?'

'হয়েছিল'—পঞ্চানন জবাব দিল, 'সন্দেহ হবার সাথেসাথেই প্লেট নেওয়া হয়েছিল।'

'কি ছিল রিপোর্টে?' মিসেস মুখার্জি উৎকর্ণ হয়ে উঠলেন।

'দু'টো লাঙ্‌স্‌ই তখন এফেক্‌টেড,' পঞ্চানন বলল।

'দুটোই?' অস্ফুট আর্তনাদ ক'রে মিসেস স্তব্ধ হয়ে রইলেন।

হঠাৎ কোন কথা বলতে না পেরে পঞ্চানন শুধু ওঁর মুখের দিকে চেয়ে রইল। দেখল, টানা টানা দুটি চোখ উপছে দু'ফোঁটা চোখের জল গাল বেয়ে চিবুক বেয়ে কোলের ওপর ঝরে পড়ে গেল। নতুন জলভারে আবার টলমল করছে চোখ। নির্বাক হয়ে চেয়ে রইল পঞ্চানন। মেঘের ছায়ায় কালো জলভরা চোখের মধ্যে ক্লাইভ ষ্ট্রীটের তিন তলার স্নুরেন বিশ্বাস যেন ফুটে উঠল। সেই টুইলের সার্ট, ভাঙাচোরা চোয়াল, মরা মাছের মত ক্লান্ত বিবশ চাউনি। ছুরি দিয়ে চারফালি ক'রে কাঁচা টমেটো কেটে খাচ্ছে স্নুরেন। কাঁচা গলাগলা টমেটো। পঞ্চাননের গায়ের মধ্যে শিরশির ক'রে উঠত।

'কাঁচা খাও কেমন ক'রে, একটা বুনো গন্ধ পাওনা স্নুরেন?'

সুরেন হাসত, বলত, 'সে প্রথম প্রথম দু'একদিন, কিন্তু ভাই, খাবে তো কাঁচা খাও, ওর সবটাই ভিটামিন।'

আঁচল তুলে দু'চোখ মুছে ফেললেন মিসেস মুখার্জি। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, 'যে অবস্থাই হোক্, চেষ্টা তো করতেই হবে, চিকিৎসা তো হওয়া চাই।'

'কিন্তু এখানে ভতির আশা যে কতটুকু তা তো নিজের কানেই শুনলেন। তবে আপনি যদি অনুরোধ করেন, বলেন একটু মিঃ মুখার্জিকে তা হলে সে কথা আলাদা।'

'আমি?' মিসেস মুখার্জি কুণ্ঠিত হয়ে বললেন, 'না না, আমি নয়। আপনিই ওঁকে ধরুন আবার। আজ নয়, আরেক দিন। আজ হয়ত আর কোন কথাই শুনবেন না। যে ক'রেই হোক ওঁকে সারিয়ে তুলুন। বলুন, আসছেন আরেক দিন?'

ওঁর মুখের দিকে চেয়ে থেকে পঞ্চানন সম্মতি জানাল, 'আসব।'

তারপর এক-পা দুই পা ক'রে ফিরে চলল পঞ্চানন। ছিটে বৃষ্টি আরও কমে এসেছে। এখন যেন কেবল সূক্ষ্ম, শুষ্ক গুঁড়া ঝরে পড়ছে চারদিকে, শব্দহীন। অফিস ঘরের পাশে গরুটার মুখ কামাই নেই। মুখ নাড়ার সাথে সাথে তেমনি লেজ দোলাচ্ছে আস্তে আস্তে। চারদিকে আর কোন সাড়াশব্দ নেই। তবু পঞ্চাননের মনে হ'ল, সে যেন আর একা নয়, নিঃসঙ্গ নয়। মনে মনে বলল পঞ্চানন, আছে, সুরেন আছে। তিনকুলে তোমার কেউ না থাক্, এই জনমানবহীন ঘাসের রাজ্যে এখনও তোমার জন্যে একজনের চোখের জল পড়ে। কাঁচড়াপাড়ার মেঘের ছায়ায় সে চোখের দৃষ্টি ছড়িয়ে রইল, সে চোখের আজ একটিমাত্র ভাষা 'ওঁকে সারিয়ে তুলুন।'